বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের

ইতিবৃত্ত।



জনৈক নেপালী প্রণীত।

কলিকাতা

আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট_ ১১৫ নং ভবন হইতে শ্রীপ্রেমতোষ বসু দ্বারা

প্রকাশিত।

শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ওল্ড বৈটকখানা বাজার রোড,

১১৯ সংখ্যক ভবনে বেনার্জ্জি যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪০।

ভূমিকা

এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সকল প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে। উঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বতন আর্য্যজাতির ধর্ম্ম, রীতি নীতি ও সমাজপদ্ধতিও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে, হিমগিরির পাদস্থিত নেপাল রাজ্যই কেবল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পুরাতন হিন্দুধর্ম্মের আদর ও গৌরব, হিন্দুরাজনীতি, ও সমাজপদ্ধতি এক্ষণে কেবল নেপাল রাজ্য মধ্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের মাতৃভাষায় অদ্যাপি এরূপ কোন পুস্তকাদি প্রণয়ন হয় নাই, যাহা পাঠ করিলে আমরা বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের ইতিবৃত্ত কিয়ৎ পরিমাণেও অবগত হইতে পারি। এই অভাব দূরীকরণের জন্য জনৈক সুবিজ্ঞ নেপালী দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকটিত হইল। ইনি বাঙ্গালা রচনায় বিশেষ পারদর্শী নহেন। এইজন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ দেবশর্ম্মণঃ মহাশয়ের অনুকম্পায় ও সাহায্যে তিনি এই পুস্তকখানি সরল বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন। ইহা আশানুরূপ ফল প্রদানে সক্ষম হইবে কি না বলা দুঃসাধ্য। ইতিবৃত্তপ্রিয় পাঠক এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কতদূর সন্তুষ্ট হইবেন বলিতে পারা যায় না। যাহাহউক ইহা জনসমাজে সাদরে গৃহীত হইলে উক্ত রচয়িতার পরিশ্রম সফল হইবেক।

প্রকাশক।

বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের ইতিবৃত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের দক্ষিণ সীমা অযোধ্যা ও ত্রিহুত, পূর্ব্বসীমা ফালেলুঁ পর্ব্বত, উত্তর সীমা হিমাচল, পশ্চিম সীমা মহকালী বা সরযূনদী। এই চতুঃসীমাবদ্ধ রাজ্যের পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ শত ক্রোশ, এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ৮০ অশীতি ক্রোশ, সুতরাং ইহার ভূপরিমাণ ন্যূনাধিক ৪০,০০০ হাজার বর্গক্রোশ। এই ৪০,০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ ভূমি পূর্ব্ব, উত্তর, ও পশ্চিমে পর্ব্বতময়, দক্ষিণ সীমা সমতল-ক্ষেত্র। এই সমতল ক্ষেত্রকে তরাই কহে, ইহার বিস্তার ন্যূনাধিক ১৫।১৬ ক্রোশ, উত্তরে হিমাচল হইতে প্রায় ৫০।৬০ ক্রোশ। দক্ষিণে বা তরাইয়ের উত্তর সীমায় মহাভারত নামে এক পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া আছে। মহা-ভারতের পাদদেশে এক অতি নিবিড় অরণ্যানী। এই অরণ্যানীও আপূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তৃত। শাল এই কাননের প্রধান বৃক্ষ। অল্প সংখ্যায় শিশু এবং অন্যান্য বৃক্ষও জন্মিয়া থাকে। ব্যাঘ্র, হস্তী, খড়গী, মহিষ, ও গৌরী গাভী কাননের প্রধান জন্তু। গৌরী গাভী এক প্রকার বৃহদাকার গোজাতী, ইহার শরীর যেমন প্রকাণ্ড, বলও তেমনি অপরিসীম। মহিষাদির কথা দূরে থাকুক, অতি প্রচণ্ড ভীম পরাক্রম খড়গীও যুদ্ধে উহার নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। ইহার শৃঙ্গদ্বয় অতি প্রকাণ্ড ও স্থূল। কিন্তু অদ্যাবধি নেপালবাসীরা এই জন্তুকে

মনুষ্যের উপকারোপযোগী কোন কার্য্যে ব্যবহার করিতে চেষ্টা পায় নাই।

রাজা এই কাননের একমাত্র অধিকারী, ইহার বৃক্ষ পশু প্রভৃতি সমস্তই রাজার সত্বাধীন। কোন ব্যক্তি ইহার বৃক্ষ-চ্ছেদন, বা ইহাতে মৃগয়া করিলে নিয়মানুসারে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে।

নেপালের ভূমি সাধারণতঃ পার্ব্বত্য হইলেও সামান্যতঃ অতি উর্ব্বর। অল্প কর্ষণেই প্রচুর শস্য উৎপাদন করে। তরাই বিশেষ উর্ব্বর। পার্ব্বত্য প্রদেশে মকাই বা ভুট্টা এক-মাত্র উৎপন্ন শস্য। ইহাই সাধারণ নেপাল বাসীর আহার। তরাই এবং অন্যান্য সমতল ক্ষেত্রে ধান্য এবং সর্ষপ অড়র কলাই প্রভৃতি কতিপয় রবিশস্যও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশে ও পর্ব্বতের পাদদেশে নদীগর্ভেও এক প্রকার কদর্য্য ধান্য জন্মে। সমতল প্রদেশে বার্ত্তাকু, অলাবু, শাক, প্রভৃতি তরকারীও উৎপন্ন হয়। আম, কাঠাল, আনারস, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফলও নেপালে সুলভ।

চারটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী উত্তর হিমাচল হইতে বহির্গত হইয়া নেপাল রাজ্য মধ্যে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে কৌশিকী, মধ্যে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতী, পশ্চিমে শালগ্রামী বা গণ্ডকী। হিমাচলে চমরী-গাভী, ও কস্তুরী-মৃগ যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। নেপালের খনিজের মধ্যে পশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশে তাম্র, ও সীসক; লৌহ, ও গন্ধক প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নেপালে ছয় ঋতুই অনুভূত

হইয়া থাকে, কিন্তু হিমাচলের অঙ্কস্থাপিত বলিয়া শীতই এই দেশের প্রধান ঋতু। শীতে পার্ব্বত্য প্রদেশে যথেষ্ট বরফ্ পড়িয়া থাকে। নেপালের গ্রীষ্ম আমাদিগের হেমন্তের সদৃশ। তরাই ভিন্ন নেপালের জল বায়ুও সর্ব্বত্র অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যজনক। তরাইয়ের জল বায়ু অতীব পীড়া-জনক। তরাই হিমাচলের দক্ষিণ পাদদেশে বিসারিত সমতল ক্ষেত্র। তুহিন গিরি হিমাচলের অধিত্যকা হইতে এতা-দৃশ প্রভূত জল-প্রবাহ তরাইয়ে আসিয়া পতিত হয়, যে সমস্ত নদীগর্ভে নিঃস্বরণের অবকাশ না পাইয়া কতক অংশ স্থলে জমিয়া থাকে, সুতরাং তরাইয়ের ভূমি অতীব আর্দ্র। এই আর্দ্রতা নিবন্ধন সহজেই ইহাতে বিবিধ বিষ বৃক্ষের নিবিড় বন উৎপন্ন হইয়া ঐ বদ্ধ জলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কালে ঐ বদ্ধ জল বনের পত্রাদি সহযোগে পচিয়া তাহা হইতে এক মানব-জীবন-নাশক প্রখর বিষময় বাষ্প উত্থিত হয়। এই বিষবাষ্প নিবন্ধন তরাইকে সাক্ষাৎ যমসদন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নেপালের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম তেমনই সম্ভ্রম-জনক। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর বিচিত্র কুসুম-শোভিত বিবিধ ফলভারাবনত তরু-শ্রেণী। নানা বিহঙ্গম-নিনাদিত মকরন্দ-বাসিত নির্য্যাসামোদিত কানন ও উপকানন। কল-নাদিনী নির্ঝরিণী। এই সমস্ত দর্শনে যেমন শ্রোত্র ও নয়ন পরিতৃপ্ত হয় তেমনি মনোমধ্যে কোমল ভাবের আবির্ভাব হয়। অতিশয় বিস্তৃতশাখ বনস্পতি, উত্তাল শাল ও দেব দারু এবং তুষারমণ্ডিত শুভ্রকায় ভূমান্ হিম গিরি ও উপগিরি

সকল দর্শন করিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে এক অত্যুন্নত গভীর সম্ভ্রমসহকৃত অলৌকিক ভাব আবির্ভূত হইয়া অতি ক্ষুদ্র মনকেও বিস্ফারিত ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলে। নেপালে প্রকৃতি দেবী যেন সাক্ষাৎমূর্ত্তি হইয়া উন্মত্তবৎ উলঙ্গ ভাবে নৃত্য করিতেছেন। দর্শনমাত্র তাঁহার সেই লোকাতীত উন্নত ভাব সহসা দর্শকের মনোমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। বিষাদ, অবসন্নতা, কার্পণ্য, দীনতা প্রভৃতি জড়ভাব সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়; মন তাহারই ন্যায় উন্মত্ত হইয়া নাচিতে থাকে। কি কবি, কি যুযুৎসু, কি বিজ্ঞানলিপ্সু, নেপালে প্রকৃতি দেবী, সকলকেই শিক্ষার্থে নিয়ত স্বয়ং সমাহ্বান করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নেপালরাজ্যের অধিবাসী প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, পার্ব্বত্য ও সমতলবাসী। পূর্ব্ব পার্ব্বত্য জাতিকে কিরাতী বা কিরাত ও পশ্চিম পার্ব্বত্য জাতিকে গুরুং কহে। উভয় জাতিই অসভ্য ও ম্লেচ্ছাচারী, দুষ্টপ্রকৃতি, কিন্তু বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায় ও সাহসী, যুদ্ধকার্য্যে ইহারা বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিরাত জাতি সর্ব্বাপেক্ষা নেপালের আদিম আধিবাসী বলিয়া জানিত। ইহাদিগের আকৃতির সহিত চীনদিগের আকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তীর্ণ, নাসিকা খর্ব্ব, ও চক্ষু ক্ষুদ্র। এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে ইহারা আদৌ চীনের

সীমা হইতে আসিয়া নেপালে বসতি করিয়াছিল। ইহাদিগের বর্ণ গৌর। কিরাতী স্ত্রীলোক বিলক্ষণ সবলাঙ্গী, ভারবাহন প্রভৃতি বল ও পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকে। কিরাত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু অতীব ম্লেচ্ছাচারী, মাংস ভক্ষণে ইহাদিগের কোন বিচারই নাই। হস্তী, ভল্লুক প্রভৃতি বন্যজন্তুর মাংসও পরমাস্বাদে ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদিগেব মধ্যে বালবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, এবং পরিণয় ম্লেচ্ছবিধানে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে পরিণয় বন্ধন স্বামীর আমরণ স্থায়ী। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই।

রাজ্যের মধ্যভাগবর্ত্তী সমতলবাসী দুই জাতিতে বিভক্ত প্রথম—নেওয়ার ; দ্বিতীয়—গোরখা। নেওয়ার এই সমতল প্রদেশের আদিম অধিবাসী। ইহারা দুর্ব্বলকায় অলসপ্রকৃতি ভীরুস্বভাব ও ম্লেচ্ছাচারী। কুক্কুট ও মহিষাদির মাংস আহার করে। নাম মাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকে। নেওয়ার কামিনী দেখিতে অতীব সুন্দরী। সৌন্দর্য্যে ইহারা য়িহুদি কামিনী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। খুটিলা নেওয়ার কামিনীর প্রধান অলঙ্কার ; ইহা এক প্রকার কর্ণভূষণ। নেওয়ারদিগের মধ্যে বিবাহবন্ধন অত্যন্ত শ্লথ। ইচ্ছা হইলে স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বা অন্য পুরুষ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদিগের অবস্থাও অত্যন্ত মন্দ, বিজেতা গোরখা জাতির উৎপীড়ন, ইহাদিগকে দাসবৎ সহ্য করিতে হইতেছে। ইহাদিগের ধন, প্রাণ, স্ত্রী পুত্র, পরিবার সমস্ত গোরখার ইচ্ছাধীন।

দ্বিতীয়, সমতলবাসী গোরখা। গোরখা হিন্দুজাতি এবং বর্ত্তমান রাজবংশ। ইহারা প্রথমে নির্ব্বাসন ও তীর্থ-দর্শনাদি সূত্রে হিন্দুস্থান হইতে আসিয়া নেপাল রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী গোরখা নামক এক ক্ষুদ্র নগরে বসতি করে। এই জন্যই ইহারা গোরখা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের আকৃতি, প্রকৃতি, স্বভাব, আচরণ, সমাজ-প্রথা এবং ধর্ম্ম সমস্তই হিন্দু। ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু আচার, হিন্দুব্যবস্থা ও হিন্দু ব্রাহ্মণ, এক্ষণে অনেকাংশে নেপালের গোরখাদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দান ও আতিথ্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি সাংসারীকধর্ম্ম, গোরখাগৃহী, প্রাচীন আর্য্যদিগের ন্যায় সাগ্রহচিত্তে প্রতিপালন করে। আচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এখনও গোরখাদিগের সেই ভূদেব। ইহারা উদার স্বভাব, ধর্ম্মপ্রিয়, উন্নত ও সবলকায়, সাহসী, পরিশ্রমী, উদ্যোগশীল, শূর ও রণকুশল। গোরখাকামিনী অলঙ্কারপ্রিয়; সুবর্ণমুকুট ইহারা অতীব ভাল বাসে, সাধারণে শাটী পরিধান করে; কবরীবন্ধন করে না, বিবিধ অলঙ্কারাদি ভূষণে বিভূষিত এক বেণী পৃষ্ঠভাগে লম্বিত হইয়া থাকে।

গোরখা রমণীগণ ভর্ত্তার বিয়োগান্তে সহগামিনী হইয়া থাকে। নব বৈধব্যপীড়া অসহমানা কামিনীকে ভর্ত্তার সহিত চিতারোহণ করিতে কেহ উত্তেজনা করে না, বরং নিবারণই করিয়া থাকে। মহারাজ জং বাহাদুরের সহিত তাঁহার তিন রাণী চিতারোহণ করেন। মহারাজ ত্রৈলোক্য বিক্রম সাহার যুবতী পত্নি ও সেই মরণে উদ্যতা হয়েন

কিন্তু রাজমন্ত্রী মহারাজ রণদ্বীপ সিংহ তাঁহার অভিপ্রায় ব্যর্থ করেন। তৎকালে মহারাজ ত্রৈলোক্য বিক্রমের পুত্র এক্ষণকার রাজা, পৃথ্বী বীরবিক্রম, অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন। মাতার বিয়োগে পুত্রের প্রাণ রক্ষার বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হওয়াতে রাজরাণীকে সহগমন করিতে দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে বিবাহবন্ধন নিতান্ত শ্লথ হইলেও কেহ কেহ ভর্ত্তার বিয়োগান্তে সহগমন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সহমরণ প্রথাটী আর্য্যধর্ম্মের শাস্ত্রানুযোযিত এক অদ্ভুত ও লোম-হর্ষণ ব্যাপার।

প্রাচীন প্রথানুসারে আধুনিক নেপাল রাজ্যে দাস দাসী বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত। পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ইহারা দাস নামে খ্যাত হইয়া থাকে। উহাদিগের মূল্য, উহাদিগের বয়স, কার্য্যক্ষমতা ও গুণ-সাপেক্ষ। প্রভু তাহার ক্রীতদাস অথবা দাসীর উপর বিনা কারণে বিশেষ অত্যাচার করিতে অক্ষম। প্রাণহানী করিলে তিনি দেশের আইনানুসারে দণ্ডনীয়। কোন দাস অথবা দাসী প্রভুর নিকট হইতে চলিয়া গেলে তাহার উচিত মূল্য প্রত্যর্পণ করিতে হয়। নতুবা এক প্রভুর নিকট হইতে অপরের কাছে যাইবার ক্ষমতা নাই।

তরাই প্রদেশে আর এক প্রকার প্রজা বাস করে। ইহারা নীচ জাতীয় হিন্দুস্থানী। কৃষি উপলক্ষে এই প্রদেশে আসিয়া বসতি করিয়াছে। ইহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত প্রায় উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের নীচ শ্রেণীর মত।

কৃষি ও সামান্য শিল্প নেপালবাসীদিগের উপজীবিকা।

শিল্পের অবস্থা নেপালে অতি মন্দ, এমন কি সামান্য প্রয়োজনীয় বস্তুও নেপালে প্রস্তুত হয় না।

নেপালের বাণিজ্যও অতি সামান্য। কেবল শাল-কাষ্ঠ, মৃগনাভী, চামর, এবং সামান্য পরিমাণে হস্তিদন্ত ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে আমদানীর মধ্যে বিলাতী কাপড়, মশলা ও নারিকেল মাত্র। গোরখাদিগের মধ্যে বিদ্যার আদর আছে, কিন্তু উন্নতি নাই, গোরখা ভিন্ন নেপালের অন্যান্য অধিবাসী সকলই প্রায় মূর্খ। সংস্কৃত গোরখার জাতীয় বিদ্যা। রাজব্যয়ে নেপালে কতিপয় সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল বিদ্যালয়কে স্কুল কহে। স্কুলে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল বিদ্যারই পাঠনা হইয়া থাকে। পাঠার্থীদিগকে বেতন দিতে হয় না; দরিদ্র ও নিঃসহায় ছাত্রেরা রাজকোষ হইতে ভরণ পোষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইংরাজী পাঠনার জন্য বিদ্যালয়নাই। সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা স্বতন্ত্র ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কাজ কর্ম্ম সমুদায় নেপালী ভাষায় হইয়া থাকে। নেপালী ভাষা পাঠনার কোনরূপ পাঠশালাও নাই, পাঠার্থীগণ নিজ নিজ পিত্রাদি আত্মীয়ের নিকট শিক্ষা করিয়া থাকে। নেপালী মিশ্রিত ভাষা। সংস্কৃত, হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষার সংযোগে উৎপন্ন। এই মিশ্রণে বাঙ্গালারই পরিমাণ অধিক।

নেওয়ার ও কিরাতী প্রভৃতির ভাষা স্বতন্ত্র কিন্তু তাহারা গোরখাদের সহিত গোরখা ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। রাজার ভিন্ন নেপালে সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র নাই,

রাজার মুদ্রাযন্ত্রে কেবল আইন ছাপা হয়। পাঠনাদি প্রায় হস্তলিখিত পুথিতেই হইয়া থাকে। ভারত হইতে মুদ্রিত পুস্তকও নেপালে প্রচলিত আছে। কোন প্রকার সংবাদ পত্র নেপালে নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নেপাল রাজত্বের রাজধানী কাটমুণ্ড। কাটমুণ্ড দক্ষিণ সীমা হইতে ন্যূনাধিক ৩২, পূর্ব্বসীমা হইতে ১৩০, ও পশ্চিম সীমা হইতে ৩২৫ ক্রোশ দূরে অবস্থাপিত। কাটমুণ্ডের চতুর্দ্দিক পর্ব্বতে বেষ্টিত। এই পর্ব্বতের বেষ্টন অষ্ট-চত্বারিংশৎ ক্রোশ। এই অষ্ট-চত্বারিংশৎ ক্রোশ বেষ্টনের মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূ-ভাগের নামই প্রকৃত নেপাল। ইহারাই নামে বর্ত্তমান গোরখা রাজার অধিনস্থ সমগ্র অধিকার নেপালরাজ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিরূপে এবং কোন সময় হইতেই বা এরূপ হইয়াছে, পরে বিবৃত করা যাইবে।

উপরোক্ত গিরি পরিধির পাদ তলে এক অতি সুপ্রশস্ত সমবেষ্টন রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথের চতুঃপ্রান্তে চারি নারায়ণ দেবের মন্দির আছে। পূর্ব্বে চাঙ্গুনারায়ণ, দক্ষিণে বিসংখু নারায়ণ, পশ্চিমে শিখর নারায়ণ, এবং উত্তরে ইচঙ্গু নারায়ণ। চাঙ্গু নারায়ণ চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, গরুড়োপরি আরূঢ়। ইঁহার মন্দিরের ছাদ সুবর্ণে মণ্ডিত। গোরখাদিগের ইনি এক অতি প্রধান শ্রদ্ধেয় উপাস্য দেবতা। নেপালে সময়ে সময়ে ঘূর্ণ্যবায়ু সংযোগে এক প্রকার সর্পাকৃতি বাষ্প-স্তম্ভ ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধদিকে

উড়িয়া যায়। উহার বেগ এত প্রচণ্ড যে কোন মনুষ্য বা পশু উহার মধ্যে পতিত হইলে উহাকেও ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঊর্দ্ধদিকে এত উচ্চে লইয়া যায় যে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন গৃহও ইহার মধ্যে পড়িলে ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ দৃশ্য দর্শন করিলে গোরখারা বলিয়া থাকে, গরুড় সর্প হরণ করিতেছেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে ঐ সময়ে চাঙ্গু নারায়ণের গরুড়ের কণ্ঠদেশে ঘর্ম্মবারি লক্ষিত হইয়া থাকে।

গোরখারা নূতন বস্ত্রে করিয়া ঐ স্বেদ-জল গ্রহণ করে। তাহাদিগের বিশ্বাস যে ঐ ঘর্ম্মাক্ত বস্ত্র সর্পদংশনের মহৌষধ। সর্পদষ্ট মুমূর্ষু রোগীও ঐ বস্ত্র-ধৌত জল পানে পুনরুজ্জীবিত হয়। এতদ্ভিন্ন ঐ বস্ত্র-খণ্ড কবচ স্বরূপে অঙ্গে ধৃত হইয়া থাকে। বিশ্বাস এই, যে ঐ কবচধারী ব্যক্তির ছায়া সর্পের অঙ্গে পতিত হইলে, সর্প, মহৌষধি-রুদ্ধের ন্যায় গতিহীন ও হীনতেজা হইয়া পড়ে।

কার্ত্তিক মাসে এই চারি নারায়ণ দেবের মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে ঐ স্থানে দিগ্দিগন্তবাসী নানা দেশীয় নানা জাতির অতীব জনতা হয়। এই মেলা সমগ্র কার্ত্তিক বর্ত্তমান থাকে।

পরিধি পর্ব্বতের শিখর-দেশ নীরদপ্রেক্ষ্য মনোহর কাননে রিমণ্ডিত। এই কানন ও একমাত্র রাজারই সত্ত্বাধীন। ইহার বৃক্ষ ছেদন বা ইহাতে মৃগয়া করিতে কাহারও অধিকার নাই।

কাটমুণ্ড অতি ক্ষুদ্র নগর। ইহার দৈর্ঘ্য এক ক্রোশ,

বিস্তার পাদোণ ক্রোশ। রাজপথ সকল অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার। গৃহ সকল ইষ্টকে নির্ম্মিত, এবং ঘনসন্নিবেশিত। গৃহের উপরি ছাদ সমস্ত ঢালু। সাধারণতঃ গবাক্ষ ও জানালা খর্ব্ব ও অপ্রশস্ত। অধুনা ইউরোপীয় গৃহনির্ম্মাণ-কৌশল-প্রণালীতে কতিপয় সুদৃশ্য ও মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। নগর প্রবেশের চারি সিংহদ্বার। এই চারি দ্বার ভিন্ন নগরে প্রবেশ করিবার অন্য পথ নাই। রাত্রি দশটার পর নগর হইতে কাহারও নির্গম, বা নগর মধ্যে প্রবেশের অধিকার নাই। এবংউক্ত সময়ে নগর মধ্যে রাজ পথে গতায়াত করিবারও আদেশ নাই। কেবল রাজ-কর্ম্মচারীরা রজনীর সংকেতবচন প্রহরীকে জানাইয়া গমনাগমন করিতে পারেন। বিশেষ আবশ্যক হইলে অন্য লোকও একজন প্রহরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরমধ্যে বা বাহিরে যাইতে পারে। নিসিদ্ধ সময়ে কাহাকেও পথিমধ্যে দর্শন করিলে প্রহরী প্রথমতঃ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে। উত্তর নাপাইলে দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বারও জিজ্ঞাসা করিবে। তৃতীয় বারে উত্তর না পাইলে ও পলাইবার চেষ্টা করিলে তাহার প্রতি তৎক্ষণাৎ গুলি করিবার আদেশ আছে।

উত্তর হইতে পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বিষ্ণুমতী ও পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া বাঘমতী নদী আসিয়া কাটমুণ্ডের পশ্চিম দক্ষিণ কোনে মিলিত হইয়াছে। নগরের নিজ মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ। উপবনাদি-সমেত রাজভবনের বেষ্টন প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। ভবনে প্রবেশ করিবার দুইদ্বার। এক পশ্চিমে, দ্বিতীয় দক্ষিণে। গোরখা ভাষায় দ্বারকে ঢোকা কহে। পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে

হনূমানের এক মূর্ত্তি আছে। এই হনূমানের নামে রাজ ভবনের পশ্চিম দ্বারের নাম হনূমান-ঢোকা। হনূমান-ঢোকাই সাধারণের প্রবেশ ও নির্গমের পথ। হনূমান-ঢোকার কবাট সুবর্ণে মণ্ডিত। দক্ষিণ দ্বারের কবাট লৌহময়। এই দ্বার মর্য্যাদাবন্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কাহারাও নিমিত্ত উন্মোচিত হয় না।

রাজভবনের মধ্যে এক অতি সুবিস্তৃত অত্যুন্নত গগনস্পর্শী সুবর্ণ-মণ্ডিত ইষ্টক-নির্ম্মিত দেবমন্দির আছে। ঐ মন্দির জনসমাজে তুলজা দেবীর মন্দির বলিয়া বিদিত আছে। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কোন্ দেব বা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, অথবা অন্য কোন পদার্থ স্থাপিত আছে, তাহা সাধারণের কেহই জ্ঞাত নহে। তাৎকালিক সিংহাসনারূঢ় রাজা ও চারি জন পরিচারক ভিন্ন অন্য কাহারও মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। রহস্য-ভেদ করিতেও পরিচারকদিগের পক্ষে নিষেধ আছে। প্রায় ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কিরাত জাতীয় রাজার অধিকার কালে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

রাজবাটীর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধানে দুই কোত অর্থাৎ সেনা-নিবেশ আছে। পশ্চিমে কেবল গোলন্দাজ ও পূর্ব্বে কেবল পদাতিক সৈন্য থাকে। উত্তরে, উভয় সৈন্যনিবেশের মধ্যে যে মাঠ আছে তাহা সৈন্যদিগের অভ্যাসের নিমিত্ত প্রশস্ত চত্বর। কাটমুণ্ডের অধিবাসীর মধ্যে তৃতীয়াংশ গোরখা, অবশিষ্ট নেওয়ার। কাটমুণ্ড ভিন্ন নেপালে আর দুই নগর আছে। প্রথম, ললিতপত্তন, কাট-

মুণ্ডের দেড় বা দুই ক্রোশ দূরে বাঘমতীর তীরে অবস্থিত। দ্বিতীয়, ভগতকগ্রাম, কাটমুণ্ডের তিন ক্রোশ পূর্ব্ব। ইহা পূর্ব্বাধিকৃত নেওয়ার রাজার রাজধানী ছিল। ললিতপত্তন ও ভগতকগ্রামের অধিবাসী সমস্ত নেওয়ার জাতীয়। ললিত-পত্তনবাসীদিগের প্রধান জীবিকা শিল্প, ভগতক গ্রামবাসী-দিগের জীবিকা কৃষি।

কাটমুণ্ড হইতে পশ্চিমে ৪০ ক্রোশ দূরে পোখরা নামে একটী ক্ষুদ্র নগর বা গ্রাম আছে। এই গ্রামে তিনটী পোখরী বা পুষ্করিণী আছে। পোখরের নামেই স্থানের নাম পোখরা হইয়াছে। প্রথম পোখরের নাম ফেওয়াতাল, দ্বিতীয়ের নাম সোণাতাল, তৃতীয়ের নাম রূপাতাল। তিনটী পুষ্করিণীই দেবখাত, ও রাজার স্বত্ত্বাধীন। এই পুষ্করিণী-ত্রয় হইতে রাজার বার্ষিক ৪০।৫০ হাজার টাকা জলকর আদায় হয়। অন্য কাহারও তিনটীর কোনটীতেই মৎস্য মারিবার আদেশ নাই।

নেপালে দুইটী তীর্থস্থান আছে প্রথম, পশুপতিনাথ; দ্বিতীয়, মুক্তিনাথ। উভয়ের মধ্যে পশুপতি নাথই বিখ্যাত। পশুপতিনাথ কাটমুণ্ডের ১।০ ক্রোশ পূর্ব্বে বাঘমতীর তীরে অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বে জ্যোতিলঙ্গ ছিলেন এক্ষণে অষ্টবাহু শিবমূর্ত্তি হইয়াছেন। ৯০০ শত বৎসর হইল এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইঁহার মন্দির উন্নত ও প্রশস্ত। মন্দিরের ছাদ স্থবর্ণে মণ্ডিত।

মন্দিরের চারি দ্বার। পশ্চিম দ্বারের কবাট স্থবর্ণে মণ্ডিত। দক্ষিণ দ্বারের কবাট রৌপ্যমণ্ডিত। পূর্ব্ব দ্বারের

কবাট পিত্তল মণ্ডিত ও উত্তর দ্বারের কবাট লৌহময়। নিত্যই ইঁহার সেবা হইয়া থাকে। শিবরাত্রির উপলক্ষে পশুপতিনাথের মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় ভারতবর্ষ হইতে সন্ন্যাসী প্রভৃতি অসংখ্য যাত্রী এইস্থানে সমবেত হয়।

নদীর পরপারে এক দেবী পীঠ। দেবীর নাম গোশেকালী। এই পীঠ এক অতলস্পর্শ কূপ; পূর্ব্বে অনাবৃত ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহার উপর এক স্বুবর্ণ কলস স্থাপিত হইয়াছে। গোরখারা গোশেকালীকে নিরতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে। লোকে কামনা করিয়া ঐ কলস-গর্ভস্থ জলে হস্ত দিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, যে যাহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে তাহারা অসময়ের ফল প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য বস্তু সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুনা যায় যে জঙ্গ বাহাদুরের পিতা উক্ত কলসমধ্যে এক তরবারি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ঐ তরবারি এক্ষণে তাঁহার বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধর ধারণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়, মুক্তিনাথ, শালগ্রামী বা গণ্ডকী নদীর শীর্ষদেশে অবস্থিত। এইস্থানে একটি জ্বালামুখী আছে। বর্ষাকাল ভিন্ন এই তীর্থে যাত্রীগণ গমন করিতে পারে না।

কাটমুণ্ড হইতে ত্রিংশৎ ক্রোশ পশ্চিমে গোরখা গ্রাম। গোরখা গ্রাম গোরখা জাতীর প্রাচীন রাজধানী। এইস্থানে গোরখনাথ নামে এক সিদ্ধ পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইঁহারই নামে স্থানের নাম গোরখা হইয়াছে। ইঁহার মূর্ত্তি যোগীরন্যায়। মনকামনা নামে ইঁহার দেবী। দেবী মনকামনা গোরখাদিগের প্রধান দেবতা। ইঁহার সেবা অতি সমারোহে

সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাষ্টমী ও মহা নবমীতে দেবীর নিকট অন্যূন লক্ষ বলি পড়ে।

এতদ্ভিন্ন নেপালে বারাণসীর ন্যায় অগণ্য দেবস্থান আছে। মহা সমারোহে নিত্য ঐ সকল দেব দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

হিন্দুর সমস্ত পর্ব্বই গোরখা জাতীর মধ্যে প্রচলিত। দুর্গোৎসব, বসন্তোৎসব বা দোলযাত্রা, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া শিব-রাত্রি প্রভৃতি অতি সমারোহেই সম্পাদিত হয়। দশভুজার মূর্ত্তি গঠিত হয় না। ঘটে পূজা হইয়া থাকে। প্রতিপদে ঘট-স্থাপনা হয়। বিজয়ার উৎসব গোরখাদিগের অতীব মহোৎ-সব। ঘটস্থাপনা-স্থলে বিকীর্ণ মাঙ্গল্য শষ্যের যে অঙ্কুর নির্গত হয়, বিজয়ার দিন গোরখারা ঐ অঙ্কুরের মালা গলদেশে ধারণ করে। পূজনীয় ব্যক্তি আশীর্ষোগ্যদিগকে ঐ মালা দিয়া আশীর্ব্বাদ ও কপালে চন্দনের তিলক দান করেন। কাট-মুণ্ডের যাবদীয় সেনা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি বিজয়ার দিন রাজ-বাটীতে যাইয়া রাজাকে অভিবাদন করে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলে এক এক টাকা উপহার প্রদান করে। রাজা সকলকে অঙ্কুরপ্রসাদীকৃত করেন। দোলযাত্রার উৎসবে শ্রীবৃন্দান অপেক্ষাও অধিকতর সমারোহ হইয়া থাকে। গোরখারা এই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া আবীর ক্রীড়া ও নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকে। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এক উন্নত ধ্বজদণ্ড প্রোথিত করে। ঐ দণ্ডে বিবিধ চীনাংশুকের পতাকা উড্ডীন হইতে থাকে। এই ধ্বজের চতুষ্পার্শে কাটমুণ্ডের সমগ্র সেনা সসজ্জ ও সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান থাকে। তন্মধ্যে কি

সেনাবিভাগ, কি শাসনবিভাগ, উভয় বিভাগেরই প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ সমবেত হন। রাজ-নিয়মানুসারে সকলকেই ঐ সময় ঐ স্থানে অবশ্য সমবেত হইতে হইবে, না হইলে দণ্ডভাগী হইতে হয়। ব্যবস্থানুসারে প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই হরিৎবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন। মণ্ডলী মধ্যে নৃত্যগীতাদি বিবিধ আনন্দের স্রোত নিয়ত অতি পুষ্টভাবে প্রবাহিত হয়। উৎসবান্তে রাজকোষ হইতে কর্ম্মচারীগণ উৎসবকালীন আবীরাদি লেপনে নষ্টীভূত পরিচ্ছদের বিনিময় স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চতুর্দ্দশীর দিন ইংরাজ রেসিডেন্ট রাজার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন।

শিবরাত্রির উৎসবও এক অতি প্রধান মহোৎসব। একাদশীর দিন হইতে উৎসব আরব্ধ হইয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। বিশেষ সমারোহ চতুর্দ্দশীর দিন। ঐ দিন কাটমুণ্ডস্থ রাজসেনা পশুপতি নাথে সমবেত হইয়া কৌশল প্রদর্শন করে। একাদিক্রমে প্রায় এক হাজার তোপধ্বনি হয়। এবং সৈন্যগণ ক্রমান্বয়ে দা রা রা রা শব্দ করিয়া নিরন্তর বন্দুকধ্বনি করিতে থাকে। এই প্রকার পাঁচ ছয় ঘণ্টা হইয়া থাকে। ইহাকে বঢ়াই কহে। রাজা প্রধান মন্ত্রি বা প্রাইম মিনিষ্টার এবং সর্ব্ব বিভাগের প্রধানকর্ম্মচারী সকল উপস্থিত থাকেন। হিন্দুস্থান হইতে চারি পাঁচ লক্ষ লোক এই পর্ব্বোপলক্ষে পশুপতি-নাথে গমন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে অতিথিগণ রাজকোষ হইতে তণ্ডুল, দাল, লবণ ও কাষ্ঠ প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্রযাত্রা গোরখাদিগের আর এক উৎসব। ইহা অতি

প্রাচীন হিন্দুজাতির উৎসব। আমরা প্রাচীন গ্রন্থে ইহার বিষয় পাঠ করিয়া থাকি, কিন্তু বর্ত্তমান কালে হিন্দুস্থানে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পাই না। ইন্দ্রযাত্রা গোরখাদিগের সর্ব্ব প্রধান উৎসব। ভাদ্রী শুক্ল পক্ষের অষ্টমী হইতে আরব্ধ হইয়া পূর্ণিমায় শেষ হয়। পূর্ব্বোক্ত বসন্তোৎসবের ধ্বজের ন্যায় হনূমান-ঢোকার সম্মুখে এক অত্যুন্নত ধ্বজ প্রোথিত হয়। এবং মহাসমারোহে ঐ ধ্বজের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ দৈত্য বা লাখের নৃত্য। কতকগুলি ব্যক্তি ভীষণ দৈত্যের বেশ ধারণ করিয়া রাজপথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকেই লাখে বলে। লাখেদিগকে কেহই স্পর্শ করে না। গোরখারা বলে যে,উহাদিগকে যে ব্যক্তি স্পর্শ করে তাহার সমস্ত বৎসর অশুভে অতিবাহিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে অষ্টাহ সমুদায় কার্য্য বন্ধ থাকে। গোরখারা আনন্দে উন্মত্ত হয়। সমুদায় কাটমুণ্ড নগর বিবিধ ধ্বজ পতাকা প্রভৃতি মাঙ্গল্য উপচারে উপশোভিত,এবং দীপমালায় সমালোকিত হয়। নিরন্তর নৃত্য গীত হইতে থাকে। এইকয় দিবস রাত্রিতে রাজপথে গমনাগমন নিষিদ্ধ নাই। রাত্রিদিবা সমস্ত রাজমার্গেই প্রফুল্ল আনন্দোন্মত্ত পৌরজনের জনতা হইয়া থাকে। এবং সর্ব্বত্রই নিরন্তর নৃত্য গীতাদি চলিতে থাকে। ত্রয়োদশীর দিন সমারোহে রাজবাটীতে এক দরবার হইয়া থাকে। সর্ব্ব স্থানের সমুদায় প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীকে আসিয়া ঐ দরবারে উপস্থিত হইতে হয়। বৎসরের মধ্যে রাজার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইবার পক্ষে ইংরাজ-রেসিডেণ্টের এই ইন্দ্র-ধ্বজোৎসবের চতুর্দ্দশী আর এক দিন।

দেওয়ালী এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পৰ্ব্ব ও হিন্দুস্থানের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। দেওয়ালীর দিন লক্ষ্মীপূজা ও দীপদান প্রভৃতি কার্য্যসমুদায় বাঙ্গলাদেশের ন্যায়ই হইয়া থাকে। দেওয়ালী-উৎসব ত্রয়োদশীতে আরব্ধ হইয়া দ্বিতীয়ায় শেষ হয়। অমাবস্যার দিন লক্ষ্মী পূজা ও গৃহে গৃহে দীপ দান হয়। দ্বিতীয়ার দিন যথা বিধানে অবস্থানুযায়ি সমারোহে ভ্রাতৃঅৰ্চ্চনা ও তিলক দানাদি হইয়া থাকে। কিন্তু অমাবস্যার দিন দেবী কালীর অৰ্চ্চনা হয় না। বৎসরের মধ্যে এই পাঁচ দিবস জুয়া খেলার অনুমতি আছে। অন্য কোন দিবস জুয়া খেলিলে আইনানুসারে দণ্ড হইয়া থাকে।

নেওয়ার জাতীর এক জাতীয়-উৎসব আছে। উহাকে ঘোড়ে যাত্রা বলে। এই উৎসব চৈত্র মাসের কৃষ্ট পঞ্চমীতে আরব্ধ হইয়া অমাবস্যায় শেষ হয়। এইকয় দিবস নেওয়ার জাতীর সমস্ত কাজ কৰ্ম্ম বন্ধ। অনন্যকৰ্ম্মা হইয়া স্ত্রীপুরুষে উৎসবে উন্মত্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের মূৰ্ত্তি এক সিংহাসনে স্থাপন পূৰ্ব্বক ঐ সিংহাসন স্কন্ধে করিয়া ভীষণ কলরবে রাজপথে ভ্রমণ করে। ঐ সিংহাসন বহন করিবার জন্য নেওয়ারেরা অহং পূৰ্ব্বভাবে সিংহাসনের চতুৰ্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া নিবিড় জনতায় গমন করিতে থাকে। ইহা যথার্থই পৈশাচিক উৎসব। নেওয়ার স্ত্রী-পুরুষ সৰ্ব্বাঙ্গে মসী লেপন করিয়া কেহ ক্ষিপ্ত, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ মহীষ, কেহ ভল্লুক প্রভৃতির ভয়ঙ্কর সাজ সাজিয়া বিকৃত চীৎকার করিতে থাকে। যেখানে সেখানে বসিয়া মদ্যপান প্রভৃতি নির্লজ্জ আমোদ প্রমোদেমত্ত থাকে এবং অৰ্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া সৰ্ব্বত্র বিচরণ করে। মাতালের জনতায়

পথে ভদ্র লোকের গমন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যেখানে সেখানে মদ্যবিহ্বল নেওয়ার অচেতনাবস্থায় নিপতিত থাকে। ফলতঃ এইকয় দিন কাটমুণ্ড নগর নরক হইতেও ভীষণ ও বীভৎস হইয়া উঠে। সম্ভ্রান্ত নেওয়ারকামিনীরাও বুদ্ধ দেবের মন্দিরে যাইয়া মদ্যাদি পান করে, ও মত্ততায় অভিভূত হইয়া পতিত থাকে। নেওয়ার কামিনীর প্রণয়লাভ করিবার এই উৎসবই এক মুখ্য সময়। কামুকেরা অবসর পাইয়া ঐ সময়ে বাঞ্ছিত কামিনীকে আয়ত্ত করিয়া থাকেন।

হিন্দুস্থান হইতে যাত্রীদিগের নেপালে যাইবার জন্য একটী মাত্র দ্বার বা পথ আছে। ত্রিহুতের উত্তর আদাপুর হইয়া এই পথ নেপালে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ দ্বারে নেপাল রাজ্যের কলেয়া নামে এক কাছারী আছে। এই কাছারীতে উপস্থিত হইয়া কাছারীর প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিয়া যাত্রীকে ছাড় চিঠি লইতে হয়। কলেয়া কাছারী হইতে এক রাজপথ উত্তরাভিমুখে অরণ্যের মধ্য দিয়া কাটমুণ্ড গিয়াছে। এই পথের মধ্যে তিন স্থানে তিন আড্ডা বা সরকারী প্রহরী আছে। এই তিন স্থানে যাত্রীকে ছাড় চিঠি দেখাইতে হয়। প্রথম আড্ডা অরণ্য প্রবেশের পর পাঁচ ক্রোশ দূরে। ইহার নাম ভিচ্ছাখোরী। দ্বিতীয় আড্ডা ভিচ্ছাখোরী হইতে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত, হেঠোঁড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হেঠোঁড়া হইতে ছয় ক্রোশ দূরে মহাভারত পর্ব্বতে উঠিতে হয়। উঠিয়া দুই ক্রোশ যাইয়া সিসাগড়ি আড্ডা। এই সীসাগড়ি একটী দুর্গ। দুর্গস্থ প্রহরী যাত্রীর ছাড় চিঠি ও দ্রব্যাদি সমস্ত

পরীক্ষা করিয়া পরে নেপালে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করে। সীসাগড়ি হইতে অবতীর্ণ হইয়া চিতলাং নামক এক গণ্ডগ্রাম হইয়া চন্দ্রগিরি নামে এক অত্যুচ্চ শৈলে উঠিতে হইবে। এই শৈলের উচ্চতা দুই ক্রোশ। পর্ব্বতের শিখর হইতে এক ক্রোশ নিম্নে, থানকোট নগর। কাটমুণ্ড থানকোট হইতে তিন ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। সাধারণ যাত্রীরা ৫।৬ দিনে কলেয়া হইতে কাটমুণ্ড পঁহুছিয়া থাকে।

নেপালীদিগের পক্ষে নেপাল গমনাগমনের নানা পথ আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বের প্রধান পথ সিঁদুলি গড়ি হইয়া, এবং পশ্চিমের প্রধান পথ পাল্পা বা তানসিংহ হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু প্রবেশ ও নির্গম উভয় সময়েই নেপালী দিগকেও সরকারী আড্ডা সকলে দ্রব্যাদি দেখাইতে ও ছাড় চিঠি লইতে হয়।

কিন্তু শিবরাত্রি মেলা উপলক্ষে ৭।৮ দিবস নেপালে যাত্রী দিগের অবারিতদ্বার। কাহাকেও কোন আড্ডায় আবেদন করিতে অনুমতি লইতে বা দ্রব্যাদি দেখাইতে হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নেপাল রাজ্য প্রধানতঃ চারি বিভাগে বিভক্ত। (১) কাটমুণ্ড প্রদেশ, (২) পূর্ব্ব-পার্ব্বত্য প্রদেশ, (৩) পশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশ, (৪) তরাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশ সমুদায়ে দ্বাদশ আড্ডা বা শাসন বিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্বে ধনকূটা ও পশ্চিমে পালপা বা তাম্‌সিন

প্রধান। কাটমুণ্ড হইতে ধনকূটা প্রায় ১২৫ ক্রোশ ও তাম্‌সিন প্রায় ৬৬ ক্রোশ। অন্যান্য বিভাগের স্ব স্ব রাজস্ব আসিয়া প্রথমতঃ এই দুইস্থানে জমা হয়; তথা হইতে কাট-মুণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে। তরাই নয় আড্ডায় বিভক্ত। পশ্চিমে (১) বাঁকি (২) বটোন; দক্ষিণ-পশ্চিমে, (৩) পর্শা, ইহা বেতিয়ার নিজ উত্তর। দক্ষিণে (৪) কলেয়া (৫) কঠরবানা (৬) শরলহিয়া (৭) মহত্তরী, ইহা ত্রিহুতের নিজ উত্তর। পূর্ব্বে (৮) সপ্তরী (৯) মোরঙ্গ; ইহা দারজিলিঙ্গের নিজ পশ্চিম। প্রত্যেক আড্ডায় এক এক প্রধান রাজ কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদিগকে স্থবা বলে। ইহাদিগের নিকট দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মোকদ্দমারই আপীল হইয়া থাকে। নিম্নতর কর্ম্মচারিকে লেপ্টনেণ্ট কহে। ইহাঁরাও ফৌজদারী এবং দেওয়ানী উভয় মোকদ্দমা করিয়া থাকেন। সর্ব্বোচ্চ আপীল শুনিবার জন্য উপরি উক্ত বিভাগ সকলে দুইজন সর্ব্বোচ্চ রাজ-প্রতিনিধি আছেন। ইহাঁদিগকে জেনারেল কহে। একজন পশ্চিম রাজ্যে তান্‌সিনে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অপরটি পূর্ব্ব রাজ্যে ধনকূটে থাকেন। ইহাদিগের নিকট ফৌজদারী, দেওয়ানী এবং সাংগ্রামিক মোকদ্দমাও হইয়া থাকে। ইহাদিগের আপীল কাটমুণ্ড রাজ-দরবারে প্রেরিত হয়। প্রধান মন্ত্রীর পুত্র, বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃ-পুত্রাদি অন্তরঙ্গভিন্ন অন্য কাহাকেও জেনারেল পদ প্রদত্ত হয় না।

কাটমুণ্ড প্রদেশ নিজ কাটমুণ্ডের শাসনাধীন। কাটমুণ্ড প্রদেশের বিচার কার্য্য সম্পাদন ও অন্যান্য প্রদেশের আপীল

নিষ্পত্তি করিবার জন্য কাটমুণ্ডে চারিটী আদলত আছে, (১) কোটিলিঙ্গ (২) ধনসার (৩) টগসার (৪) ধর্ম্মকাছারী। এই সমস্ত আদালতের আপীল রাজদরবারে নিষ্পত্তি হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নেপালের শাসনপ্রণালী স্বেচ্ছাচার তন্ত্র। রাজাই রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভু। বর্ত্তমানে রাজার নাম মাত্র অস্তিত্ব। প্রধান মন্ত্রী বা প্রায়ইমমিনিষ্টরই রাজ্যের প্রকৃত প্রভু। রাজা ইহাঁর হস্তচালিত পুত্তলিকা মাত্র। রাজাকে একপ্রকার কারারুদ্ধ রাখিয়া প্রাইমমিনিষ্টরই নেপালে রাজত্ব করিতে-ছেন। কোন বিষয়েই রাজার হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা নাই। নিজ ভরণ পোষণ রাজা প্রাইমমিনিষ্টরের অনুগ্রহ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাইমমিনিষ্টরের একজন অন্তরঙ্গ রাজার নিকট থাকেন। ইহারই দ্বারা রাজা প্রাইম-মিনিষ্টরকে নিজ অভাব জ্ঞাপন করেন। অবগতির পর মিনিষ্টর নিজ বিবেচনামত অনুষ্ঠান করেন।

সহকারিতার জন্য প্রাইম মিনিষ্টরের এক সভা বা কাউনসিল আছে। সেনাপতি বা কমাণ্ডার ইন্ চিফ, জেন-রেল, আদালতের বিচারপতি এবং সুবা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারিগণ উক্ত কৌনসিলের সভ্য। ইঁহাদিগের সহায়তায় প্রাইম মিনিষ্টর রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা গঠনাদি রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাহ ইচ্ছাই বলবতী।

ব্যবস্থার অনেকাংশ মন্বাদি হইতে সংগৃহীত। বর্ত্তমানে

ইংরাজী ব্যবস্থা শাস্ত্রও নানাস্থলে আদর্শ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ গোরখা দিগের নিজ-জাতি মধ্যে অধিকাংশে আর্য্যস্মৃতি ব্যবহার হয়, কিন্তু অন্য জাতির সম্বন্ধে ইংরাজী আইন অনুসারে ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

চৌর্য্যাপরাধী প্রথম অপরাধে লোপ্ত্রের মূল্য অধিকারি-কে দান করিয়া নিষ্কৃতি পায়। দ্বিতীয় অপরাধে তাহার দুইবৎসর কারাবাস হয়। তৃতীয় অপরাধে চারি বৎসর। এইরূপ উত্তরোত্তর প্রতি অপরাধে দুইবৎসর করিয়া বৃদ্ধি হইয়া ষষ্ঠ অপরাধে অপরাধী যাবজ্জীবনের জন্য কারারুদ্ধ হয়। প্রথম অপরাধে অপরাধী যদি মূল্যদিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কার-াদণ্ড ভোগ করে। শতকরা এক বৎসর হিসাবে কারা আদেশ হয়। কিন্তু প্রতি-প্রদানে অসমর্থ চৌর্য্যাপরাধীর কারার ঊর্দ্ধসংখ্যা দশ বৎসর। লোপ্ত্রের মূল্য যত টাকাই হউক দশ বৎসর অতীত হইলেই অপরাধী মুক্তি পাইবে।

ব্রাহ্মণ এবং উদাসীন সন্ন্যাসীর কোন অপরাধেই প্রাণ দণ্ড হয় না। কোনরূপ কায়িক-যাতনা এবং শৃঙ্খল বন্ধনও তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। কারা মধ্যে ব্রাহ্মণ অপরাধীকে সামান্য নজর বন্দীর ন্যায় কালযাপন করিতে হয় মাত্র।

যদি কেহ ব্রাহ্মণী হরণ করে, তাহা হইলে রাজ-নিয়মানুসারে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। অপরাধী ব্রাহ্মণ হইলে দশ বৎসর কারারুদ্ধ হয়। নেওয়ার ব্যতীত অপর জাতীর পক্ষে নিয়ম এই, যে বিশেষ প্রমাণ পাইলে স্বামী রাজাকে না জানাইয়া নিজ ইচ্ছায় স্বহস্তে স্ত্রীহর্ত্তার

শিরশ্ছেদন করিতে পারে। ব্রাহ্মণ অন্য জাতীর বিধবা বা অনূঢ়া হরণ করিলে তাহাকে কোন দণ্ডই ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু অন্য জাতির সধবা হরণ করিলে তাঁহাকে কারা ভোগ করিতে হয়।

নেওয়ার যদি স্বজাতীয় সধবা হরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপে, উহার স্বামীকে একশত টাকা দণ্ড দিতে হয়। বিধবা হর্ত্তার কোন দণ্ডই নাই।

সুরাপান, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজ ব্যবস্থানুসারে নিষিদ্ধ। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুইবৎসর কাল কারা-দণ্ডে দণ্ডিত, ও জাতিচ্যুত, হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে সুরাপান করিতে দেখে বা সুরা-পায়ী বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পায়, অথচ রাজাকে যথা-সময়ে ঐ সংবাদ জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে তাহাকেও ঐ দণ্ড সহ্য করিতে হয়।

গোবধ নেপালের সর্ব্বত্র সর্ব্ব জাতির মধ্যে নিষিদ্ধ। গো ঘাতীর প্রাণ দণ্ড ব্যবস্থা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নেপাল রাজত্বের নির্দ্দিষ্ট পদাতিক সৈন্যবল চত্বারিংশৎ সহস্র, এবং অশ্বারোহী দুই সহস্র। এই সেনাকে জঙ্গী ফৌজ্ কহে। প্রধানতঃ গোরখা ক্ষত্রিয়, এবং কিরাতী ও গুরুংজাতির সৈনিক লইয়া জঙ্গী ফৌজ্ গঠিত হইয়াছে। নেওয়ার ইহার মধ্যে অবসর প্রাপ্ত হয় না। জঙ্গী সেনার পরিচ্ছদ ইংরাজ সেনার পরিচ্ছদের সদৃশ। বিশেষের মধ্যে

ইহাদিগের শিরস্ত্রাণে একএক খানি রৌপ্যনির্ম্মিত কিঙ্কিণী-মণ্ডিত চন্দ্র থাকে। এই চন্দ্রে গোরখনাথ, ভগবতী প্রভৃতি দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। পদানুসারে সৈনিক কর্ম্মচারীরা সুবর্ণ, হীরক, মুক্তা, প্রবালাদির চন্দ্র ও কিঙ্কিণী শিরস্ত্রাণে ধারণ করিয়া থাকেন।

জঙ্গীসৈনিক প্রায় সকলেই বৃত্তিস্বরূপে রাজার ভূমি ভোগ করিয়া থাকে; পরিচ্ছদ রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহার মূল্য ইহাদিগের বৃত্তি হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। শিরোধৃত চন্দ্র ও কিঙ্কিণী সমুদায় রাজার। সৈনিকদিগকে উহার মূল্য-স্বরূপে কিছুই দিতে হয় না। সৈনিক মৃত বা কর্ম্মচ্যুত হইলে উহা পুনর্ব্বার রাজভাণ্ডারভুক্ত হইয়া থাকে।

চত্বারিংশৎ সহস্র পদাতিক জঙ্গিসেনা রাজ্যের স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে। নিজ কাটমুণ্ডে সপ্তদশ সহস্র, তানসিনে চারি সহস্র, তানসিনের পশ্চিম নেপাল রাজ্যের সর্ব্ব পশ্চিম সীমা পিউটানরে দুই সহস্র। পোখরায় দুই সহস্র, কাটমুণ্ডের ৮।১০ ক্রোশ দক্ষিণ চিসাপাণিগড়ি বা সিসাগড়ি দুর্গে এক সহস্র, ধনকুঠায় দুই সহস্র। কাটমুণ্ড হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ পূর্ব্বে সিঁদুলিগড়ি দুর্গে এক সহস্র। ভাগতকগ্রাম-দুর্গে চারি সহস্র, ও গোরখাগ্রামে এক সহস্র। দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য কাটমুণ্ডেই থাকে।

নির্দ্দিষ্ট জঙ্গী সেনা ভিন্ন অনির্দ্দিষ্ট সেনা আছে। ইহাকে মিলিসিয়া ফৌজ কহে। ইহার সংখ্যা সমুদায়ে অষ্ট-চত্বারিংশৎ সহস্র। মিলিসিয়া ফৌজে নেপালের সকল জাতি-

কেই ভুক্ত করা হয়। মিলিসিয়া ফৌজকে শিক্ষা দিবার জন্য রাজ্য মধ্যে দ্বাদশ স্থান বা আড্ডা আছে। প্রত্যেক আড্ডায় চারি সহস্র সৈনিককে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এক সময়ে এক এক আড্ডায় এক এক সহস্রমাত্র উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। সহস্র সৈনিক অষ্টাহ শিক্ষা পাইয়া গৃহে গমন করে ও নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অষ্টাহ হইতে আর এক সহস্র শিক্ষার্থে আড্ডায় উপস্থিত হয়, অষ্টাহান্তে তাহারা আবার স্বগৃহে প্রস্থান করে। এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে মাসে চারি সহস্র সৈনিক এক এক আড্ডায় শিক্ষার্থে সমবেত হয়। মিলিসিয়া সৈনিকেরা মাসে নেপালী ২॥০ টাকা বেতন পায়। সৈনিকেরা স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। মিলিসিয়া ফৌজ মধ্যে ভুক্ত হওয়া না হওয়া প্রজার স্বেচ্ছাধীন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয় গৃহস্থদিগকে যুদ্ধ শিক্ষার্থে অবশ্যই এক এক বালককে মিলিসিয়াফৌজে প্রেরণ করিতে হইবে। নেওয়ার ভিন্ন অন্যান্য জাতীয় সৈনিকেরা অগ্রে এই মিলিসিয়া ফৌজে শিক্ষা পাইয়া পরে জঙ্গী ফৌজে প্রবেশ করিয়া থাকে। সময় উপস্থিত হইলে আহ্বান মাত্র যাবদীয় মিলিসিয়া সৈনিককে অবশ্যই যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইতে হইবেক।

নেপালী সেনা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রই ব্যবহার করে। এবং আধুনিক সমর-কৌশলেই শিক্ষিত হইয়া থাকে। সমর-গুরু সকলেই স্বদেশীয়। কামান, বন্দুক, তলবার, বারুদ প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ নেপালে, নেপালী সামগ্রীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। নেপালীবন্দুক পূর্ব্ব ব্যবহৃত ইংরাজী ব্রিচ্‌লোড্‌রের সদৃশ এবং উহা হইতে কোন অংশেই

ন্যূন নহে। অস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্যই কাটমুণ্ডে এবং তানসিনে কারখানা আছে, উভয় কারখানাই রাজার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত প্রস্তাবে নেপালের সমস্ত ভূমিই রাজার স্বত্বাধীন। প্রজাসমস্ত রাজারই, কিন্তু রাজা প্রজার নিকট হইতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে রাজস্ব আদায় করেন না, বিভাগানুসারে রাজস্বের ইজারা বন্দোবস্ত আছে। ইজারদারদিগের ইজারার মৌরশী বন্দোবস্ত। ইচ্ছা করিলে রাজা কোন ইজারদারকে অধি-কারচ্যুত করিয়া তৎস্থানে অন্য ইজারদারকে স্থাপিত করিতে পারেন না। ইজারদার নিঃসন্তান বা উত্তরাধিকারী-বিহীন হইলেই তাঁহার ইজারা পুনর্ব্বার রাজ-সরকার-ভুক্ত হয়। কাটমুণ্ড বা খাস নেপালে ইজারদারদিগকে মৈনায়িক, পার্ব্বত্য-প্রদেশে মুখিয়া, এবং তরাইয়ে চৌধুরী বলে।

ইজারদারেরাই প্রজাকে ভূমির পাট্টা বিলি করেন ও ভূমির কর আদায় করেন। নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করিয়া তাহাকে বিভাগের সুবার নিকট প্রেরণ করিতে হয়। এবং নির্দ্দিষ্ট করের ন্যূনতা হইলে নাতোয়ান প্রজাকে দেখাইয়া দিতে হয়। ইজারদার স্বীয় বৃত্তি-স্বরূপে ঐ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব হইতে শতকরা পাঁচ টাকা প্রাপ্ত হন। ইচ্ছা হইলেই ইজারদারেরা প্রজার পাট্টা কাড়িয়া লইয়া তৎস্থানে অন্য প্রজাকে বসাইতে পারেন না।

ব্রহ্মত্তর, দেবত্তর ও জায়গীর ভূমি সমস্ত নিষ্কর। অধি-

কারীরাই স্বস্ব ভূমির উপস্বত্বভোগী ও সর্ব্বময় প্রভু। প্রজাদিগের সামান্য সামান্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা তাঁহারই নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। এই সকল ভূমিকে বির্তা বা বৃত্তি কহে।

বৃত্তি ভিন্ন নেপালে আরও দুই প্রকার নিষ্কর ভূমি আছে। (১) রাজবান্ধা (২) সর্ব্বাঙ্গমাফী। পূর্ব্বকালে রাজারা যে সকল ভূমি বান্ধা বা পণ রাখিয়া প্রজার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সকল ভূমিকে রাজবান্ধা কহে। আর পূর্ব্বীয় রাজারা কাহারও প্রতি তুষ্ট হইয়া প্রসাদ-স্বরূপে যে ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সর্ব্বাঙ্গমাফী। রাজবান্ধা ও সর্ব্বাঙ্গমাফী এবং বৃত্তি-ভূমিই নেপালে বিক্রয় হইয়া থাকে। যাহাদিগের এইরূপ জমি অধিক পরিমাণে আছে, তাহারাই নেপালের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। রাজা, ঋণ পরিশোধ করিয়া রাজবান্ধা ভূমি উদ্ধার করিতে যত্নবান্ আছেন, কিন্তু প্রজারা তাহাতে সম্মত নহে। এক্ষণে ঐ সকল ভূমির আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং ভূমির দখলকারীরা ভূমি ছাড়িতে চাহে না। জোর করিলে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে দেখিয়া, রাজা জোরও করিতে পারেন না।

এতদ্ভিন্ন নেপালের পশ্চিম সীমায় দুইটী ক্ষুদ্র অধীনরাজা আছেন। প্রথম, বাজাঙ্গীতে, দ্বিতীয়, জাজরকোটে। ইহাঁরা প্রাচীন গোরখা রাজার জামাতৃ-বংশীয়। ইহাঁরা কর স্বরূপে কাটমুণ্ডের রাজকোষে স্ব স্ব উপস্বত্বের অর্দ্ধাংশ প্রেরণ করিয়া থাকেন। নিজ নিজ অধিকারের শাসন ভার ইহাঁ-

দিগের হস্তেই ন্যস্ত আছে সত্য, কিন্তু অন্যায় করিলে নেপাল দরবারে ইহাঁদিগের বিরুদ্ধে আপিল হইয়া থাকে।

প্রদেশ ভেদে নেপালের প্রজাদিগের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে রাজকর নির্দ্দিষ্ট আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশ সমুদায় নূতন আবাদী ভূমি, এই প্রদেশের প্রজাদিগকে প্রত্যেক গৃহস্থ অনুসারে ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক টাকা রাজস্ব দিতে হয়। এই রাজস্বের আর বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। স্ব স্ব পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ভূমির মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থ যত ভূমি আবাদ করিয়া যত শস্যই উৎপাদন করুক না কেন, তাহাদিগের নিকট ঐ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট এক টাকার অতিরিক্ত কর গৃহীত হইতে পারিবে না। তরাইয়ের ভূমি সমুদায় হিন্দুস্থানের ন্যায় বিঘা হিসাবে বিলি আছে। প্রত্যেক বিঘার হার ঊর্দ্ধসংখ্যা চারি টাকা। উৎকৃষ্ট এক বিঘা ভূমিতে চত্বারিংশৎ মণ ধান্য উৎ-পন্ন হয়।

শস্য-ভূমি ভিন্ন কোন স্থানে প্রজাদিগকে অন্য প্রকার কোন ভূমিরই কর দিতে হয় না। প্রজাদিগের বসতি বাটী সকল নিষ্কর। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি নেপালে যাইয়া বসতি করিতে প্রার্থনা করিলে রাজার নিকট বসতির জন্য নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইবেক। কেহ কোন দেব মন্দির, ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা, কি পথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি সৎকার্য্য করিয়া ঐ অনুষ্ঠানের রক্ষার নিমিত্ত যদি কোন অনাবাদী জমি দেখাইয়া সরকার হইতে উহা প্রর্থনা করে, সরকার তদন্ত করিয়া তাহাকে ঐ ভূমি নিষ্কর দান করিয়া থাকেন।

নিজ নেপালের ভূমির হার অতি উচ্চ, প্রতি বিঘার

ত্রিশ হইতে ছত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত। শস্য ও এস্থানে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

নেপালের রাজস্ব তিন উপায়ে সংগৃহীত হয়। (১) ভূমির কর, (২) অরণ্যের শালকাষ্ঠ (৩) তাম্রের খনি। কাষ্ঠে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ, এবং তাম্রের খনি হইতে প্রায় পাঁচ লক্ষ, বার্ষিক মুদ্রা আদায় হয়। ভূমির কর পাদোণ দুই কোটী। পোখরার তিনটী হ্রদ হইতেও বার্ষিক ৪০।৫০ হাজার টাকা আদায় আছে।

নেপালে তিন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত। স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাম্রময়। স্বর্ণমুদ্রা ওজনে ১০৷৷০ মাষা; মূল্য, নেপালী ২৩৲ টাকা। বাজার দরে কখন ১৮৲ কখন ১৮৷৷০ কোম্পানি টাকায় বিক্রীত হয়। রৌপ্য মুদ্রার ওজন ১০ মাষা। কোম্পানির ১০০ টাকায় নেপালী টাকা কখন ১১৮ কখন বা ১২০ পাওয়া যায়। মুদ্রার এক পৃষ্ঠে গোরখ-নাথের ও অন্য পৃষ্ঠে কালিক রাজার নাম অঙ্কিত থাকে। তাম্রমুদ্রা দুই প্রকার, সচরাচর পয়সার ন্যায় গোলাকার ও ওজনে অর্দ্ধ তোলা, আর এক প্রকার পয়সা পিণ্ডমাত্র। ইহাকে হিন্দুস্থানে গোরখাপুরি পয়সা কহে। তানসিনের টাক্‌শাল হইতে ১০।১২ লক্ষ টাকার এই পয়সা বর্ষে বর্ষে গোরখপুরে প্রেরিত হয়, এবং কৌড়ীর ন্যায় ভিন্ন সময়ে ভিন্ন দরে বিক্রয় হয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমান নেপালরাজ্য পূর্ব্বে চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরণ্য রাজত্বে বিভক্ত ছিল। মধ্যভাগে, কাটমুণ্ড বা নেপালরাজ্য। পশ্চিমে, গোরখ-গ্রাম বা গোরখা রাজ্য। কিঞ্চিৎ পশ্চিমোত্তরে পাল্পা বা তানসিন রাজ্য। এবং পূর্ব্বে ভাগতকগ্রাম রাজ্য। এই চারি রাজ্যের মধ্যে নেপাল রাজ্যই অধিকার ও প্রভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। অন্যান্য রাজ্যগুলির নামানুসারেই দেখা যাইতেছে, যে ঐ সকলের অধিকার অতি স্বল্প বিস্তৃত সুতরাং প্রভাবও তদনুরূপ ছিল।

কাটমুণ্ড ও ভাগতকগ্রামের রাজ্য নেওয়ার জাতীয়। তানসিনের রাজবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিত। গোরখ-গ্রামের রাজবংশ সাক্ষাৎ রামচন্দ্রের কুলপ্রসূত। রাজস্থানের চিতোরগড়ের অধিপতি রাণা বংশের কোন বংশোদ্ভব গোরখা গ্রামে যাইয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার নাম কি, কোন্ সময়ে কি সূত্রেই বা গমন করিয়া তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, তদ্বিষয়ে আমরা কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হই না। গোরখাদিগের কিম্বদন্তীও তদ্বিষয়ে মৌন।

১২৬ বৎসর গত হইল, বা বাঙ্গালা ১১৬৩ ও ইংরাজী ১৭৫৬ সালে জয়প্রকাশমল্ল নামে রাজা কাটমুণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। রাজা জয়প্রকাশ সাক্ষাৎ নরপিশাচ। তাঁহার দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, মমতা, ক্ষমা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত

সমস্ত সদ্‌গুণের গন্ধমাত্র ছিল না। প্রত্যুত তিনি গর্ব্ব, নিষ্ঠুরতা, উগ্রতা, ক্রোধ, অত্যাচার-প্রিয়তা, জিঘাংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট-গুণের পূর্ণাবতার ছিলেন। তাহার সমকালিক বাঙ্গালার অধীশ্বর সিরাজ-উদ্দৌলা বোধ হয় তাঁহার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একে বয়সে অপরিণত যুবা, তাহাতে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া জয়প্রকাশের পৈশাচীক দুষ্প্রবৃত্তি সকল রক্তমুখী হইয়া উঠিল। জয়প্রকাশও স্বহস্তে অতুল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল প্রবৃত্তি যথেচ্ছা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজাবর্গকে তাঁহার সামান্য ক্রীড়নক বোধ করিলেন। প্রজার ধন, প্রাণ, স্ত্রী, পরিবার সমস্ত স্বেচ্ছায় বলপূর্ব্বক আহরণ করিয়া ভোগ করিতে লাগিলেন। যে কোন সুন্দরী যুবতী নেত্রগোচর হইত, জয়প্রকাশ তাহাকেই আনিয়া, স্বীয় অন্তঃপুরচারিণী করিতেন। রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্রই ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। শাসন ও পালনের নাম পর্য্যন্তও লোপ পাইল। ভীষণ অত্যাচারে, উৎপীড়িত হইয়া প্রজামণ্ডলী হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু দুরাশয় জয়প্রকাশের কিছুতেই চৈতন্য হইল না। নরপিশাচ ক্রমশঃই উগ্র রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। কালভৈরবনাথ নামে এক দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বীভৎস পৈশাচিক প্রথায় অর্চ্চনা এবং আগন্তুকদিগকে ধরিয়া ইষ্টদেবের নিকট নরবলি দান করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ নেপাল-রাজ্য সাক্ষাৎ নরক-রাজ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং প্রজাবর্গ ঘোর ভয়ে ভীত হইয়া পরিত্রাণার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়িল, এবং পরস্পর নিয়ত বলিতে লাগিল, এই নর রাক্ষস

রাজার মৃত্যু ভিন্ন আমাদিগের আর কোনরূপে নিস্তার নাই। সকলে একমন, এককার্য্য হইয়া চেষ্টাও করিতে লাগিল, কি উপায়ে রাজার নিধন সাধন হইবে।

এই সময় পৃথ্বীনারায়ণসাহা নামে পুরুষসিংহ গোরখা-গ্রামের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে ছিলেন। জয়প্রকাশ যেমন নরপিশাচ, রাজা পৃথ্বীনারায়ণ তেমনি নরদেব ছিলেন। সূর্য্যবংশোচিত প্রসিদ্ধ লোক-মর্য্যাদা, জ্ঞান, ধর্ম্মনিষ্ঠা, লোক-প্রিয়তা, ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সমস্তই পৃথ্বীনারায়ণের পবিত্র দেশে পরিপুষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইত। যে রামচন্দ্র প্রজা-বৎসলতার অনুরোধে জানকী-বিসর্জ্জন-জনিত দুর্ব্বিসহ যাতনা স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, রাজা পৃথ্বীনারায়ণের ধমনীতে সেই সূর্য্যকুল-চূড়ামণি লোকনাথ রামচন্দ্রের পবিত্র শোণিত বহমান ছিল। সুতরাং প্রজারঞ্জন ও প্রজা-পালনই যে শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম, পৃথ্বীনারা-য়ণ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, এবং কায়মনে তৎসাধনে নিরন্তর যত্নবান্ ছিলেন: প্রজাবর্গও সকলেই রাজভক্ত ছিল, এবং সুশাসনে প্রতিপালিত হইয়া রামরাজ্যের ন্যায়ই সুখে কালযাপন করিত।

পৃথ্বীনারায়ণের দুই কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। মধ্যমের নাম শূরপ্রতাপ, ও সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম দলমর্দ্দন। ভ্রাতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃভক্তি কাহাকে বলে, আমরা রামলক্ষ্মণের চরিত্রেই তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদিগের বংশোদ্ভব ভ্রাতৃ-ত্রয় পৃথ্বীনারায়ণ, শূরপ্রতাপ ও দলমর্দ্দনের পরস্পরের মধ্যে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ রামলক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃভক্তি

সম্বন্ধ ছিল। পৃথ্বীনারায়ণ দুই কনিষ্ঠ ভিন্ন জানিতেন না, কণিষ্ঠদিগের পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না, এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে কনিষ্ঠদ্বয়কে স্নেহ ও লালন পালন করিতেন। কনিষ্ঠেরাও জ্যেষ্ঠ ভিন্ন জানিতেন না, এবং অনুচরের ন্যায় জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হইতেন। তিন ভ্রাতাই শূর, সাহসী, নির্ভীক ও উদারচেতা ছিলেন।

কালুপাঁড়ে নামে এক মাহাত্মা পৃথ্বীনাথের কার্য্যসচিব ও সেনা-নায়ক ছিলেন। তাঁহার অমাত্য-কর্ম্মে যেমন বিচক্ষণতা ছিল, রণকৌশলেও তিনি তেমনি শূর ও নিপুণ ছিলেন।

জয়প্রকাশ ও পৃথ্বীনারায়ণের সমকালে দীর্ঘসিংহ ভাগতকগ্রামের এবং মুকুন্দসিংহ তানসিনের দণ্ডধর ছিলেন। এই উভয় রাজাই বয়সের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অধর্ম্ম ও অত্যাচারের প্রভাব কখনই বহুকাল স্থায়ি হয় না। অত্যাচারী রাজাও কোন কালে অধিক দিন সিহাংসনারূঢ় থাকিয়া স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন না। প্রজাই রাজার বল। প্রজা যতকাল অনুরক্ত থাকে, রাজার ততদিনই অস্তিত্ব। প্রজা বিরক্ত হইলেই রাজা যতই কেন দুর্দ্দান্ত হউন না, সহসা বা বিলম্বে তাঁহাকে অবশ্যই সিংহাসনচ্যুত ও বিনষ্ট হইতে হয়। অত্যাচার ও প্রজাপীড়নই রাজার প্রধান ছিদ্র। ছিদ্রান্বেষী শক্রগণে এই মহৎ ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে আনায়াসেই রাজাকে উন্মূলন করিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঘোরতর অত্যাচারে নিপীড়িত

হইয়া জয়প্রকাশের প্রজাগণ নিয়ত হাহাকার ও নিরন্তর রাজার উচ্ছেদ বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিল। ক্রমে জয়-প্রকাশের পৈশাচিক আচার দেশে দেশে ঘোষিত হইল। নিকটে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার স্বরূপে বিরাজ করিতে ছিলেন। নেপালবাসী প্রকৃতিবর্গের দুর্ব্বিসহ যাতনার সংবাদ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কৃপালু হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিল। তিনি দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষত্র স্বভাব শৌর্য্য ও মনুষ্যত্বের বশীভূত হইয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, মিত্রভাবে জয়-প্রকাশকে এই ভাবে এক উপদেশগর্ভ পত্র লিখিলেন। যে "হে ভ্রাতঃ ধর্ম্মই বলবৎ এবং ধর্ম্মেরই সর্ব্বত্র জয়। প্রজাপীড়ন রাজার ধর্ম্ম নহে, সর্ব্বথা প্রজাপালন ও প্রজারঞ্জনই রাজার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। মানবের দুঃখসাধন করাও মানবধর্ম্মবিরুদ্ধ। অতএব তুমি এই সকল বিবেচনা করিয়া অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত হইয়া ধর্ম্মাচরণ ও যথা বিধানে প্রজাপালন করিতে যত্নবান হইবে। নতুবা ঈশ্বর কখনই তোমার মঙ্গল করিবেন না। গুরুতর পাপ-ভারে আক্রান্ত হইয়া অবশ্যই ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় তোমাকে অচিরে মগ্ন হইতে হইবে। ভরশা করি তুমি অন্যতর না ভাবিয়া মিত্রবোধে আমার বাক্যে কর্ণপাত করিয়া স্বীয় প্রজাবর্গকে ও আমাদিগকে সুখী করিবে।"

সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত আছে, যে দুষ্টের প্রতি হিতোপদেশ প্রয়োগ আর জ্বলন্ত অনলে ঘৃতসেক একই কথা। যাহার প্রকৃতি দুষ্ট ও বুদ্ধি বিপরীত সে বিপরীতই দর্শন করিয়া থাকে। শত্রুকে মিত্র ও মিত্রকে শত্রু জ্ঞান, ইষ্টকে অনিষ্ট ও

অনিষ্টকে ইষ্ট জ্ঞান করে, এবং করাল মৃত্যুকে তৃপ্তিকর জীবন ভাবিয়া আগ্রহ সহকারে আলিঙ্গন করে। সুতরাং মহাত্মা পৃথ্বীনারায়ণের সদুপদেশের বিপরীত ফল ফলিল। রাজা পৃথ্বীনারায়ণ পূজিত ও পুরস্কৃত না হইয়া নির্দ্দয়রূপে তিরস্কৃত হইলেন। ঘোর অহঙ্কৃত দুষ্টাশয় দুরাচারী জয়-প্রকাশ, রাজা পৃথ্বীনারায়ণের লিপি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অপ্রতিহত মর্য্যাদা ও প্রভাবের অবমাননা হইল ভাবিয়া একেবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া নিষ্কাম সহজমিত্র মহাত্মা পৃথ্বীনারায়ণকে জঘন্য শত্রুজ্ঞান করিয়া, দর্পিত-ভাবে এই অর্থে এক তিরস্কার-গর্ভ প্রত্যুত্তর লিখিলেন যে, "মনুষ্য আপনাকে না জানিলেই সহসা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তুই ক্ষুদ্র হইয়া যখন আমার আচরণের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়াছিস্ তখন তোর মৃত্যু নিকট-বর্ত্তী হইয়াছে। কালই তোর ক্ষুদ্র দেহে এই সাহস উৎ-পাদন করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সত্বর বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবি নচেৎ তোর নিস্তার নাই। অথবা, আমি অনেক দিন হইতে মানস করিতেছি, দেব ভৈরবনাথের নিকট এক মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাকে বলি-প্রদান করিব। এক্ষণে তোকেই সেই বলি স্থির করিলাম।"

এই পত্রী হস্তগত হইবামাত্র রাজা পৃথ্বীনারায়ণের ক্ষত্র-তেজ প্রজ্বলিত হইয়া উচ্ছসিত ভাবে ধমনী মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজা পাদাহত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কিন্তু কার্য্যসাধক ধৈর্য্য কোন অবস্থাতেই কৃতকর্ম্মা প্রকৃত শূর মহাত্মাদিগকে পরিত্যাগ করে না। রাজা পৃথ্বী-

নারায়ণ ক্ষণপ্রবৃদ্ধ ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিয়া প্রতি-চিকীর্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠদ্বয় ও অমাত্য কালুপাঁড়েকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে পর, তাঁহাদিগকে জয়প্রকাশের গর্ব্বিত পত্র প্রদর্শন ও স্বীয় সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে তাঁহাদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্র দৃষ্টেই কুমার শূরপ্রতাপ ও দলমর্দ্দন তৎক্ষণমাত্রে সৈন্যচালন করিবার অনুমতি দানে ভ্রাতাকে অনুরোধ করিলেন। কালুপাঁড়েও উত্তর করিলেন, মহারাজ, আপনি যুদ্ধার্থ সজ্জিত হউন। এই ন্যায়যুদ্ধে মহারাজ অবশ্যই বিজয়ী হইবেন। কিন্তু গাম্ভীর্য্য-সাগর পরিণামদর্শী, কার্য্যকুশল রাজা পৃথ্বীনারায়ণ উত্তর করিলেন, অগ্রে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্য-সিদ্ধি-পক্ষে মহা সন্দেহ থাকে। যে কার্য্যের সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ বিবেচনা, কালসাপেক্ষ। অতএব আমি তোমা-দিগকে একদিনের সময় দিলাম। তোমরা অদ্য বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া কল্য কর্ত্তব্য বিষয়ে আমাকে উপদেশ দান করিবে। এই বলিয়া রাজা সকলকে বিদায় করিলেন, এবং চিন্তায় মগ্ন হইয়া কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যামিনীযোগে রাজা একাকী দেবী মনকামনার মন্দিরে যাইয়া সহস্র মূলমন্ত্র জপ করিয়া অভীষ্ট দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। অর্চ্চনান্তে ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, জননী, আমি রাজধর্ম্ম ও ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষার্থী হইয়া মানস করিয়াছি, অত্যাচার নিপীড়িত নেপালবাসী প্রকৃতি-

বর্গের উদ্ধার সাধনার্থ দুর্ব্বৃত্ত জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব। এই বিষয়ে আপনার অনুমতি কি স্বপ্নে আমাকে প্রত্যাদেশ করুন। দেবীর অর্চ্চনাবসানে রাজা গোরখনাথের মন্দিরে গমন করিয়া উক্তরূপ প্রার্থনা করিলেন। পরে নিজ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে নিদ্রাবস্থায় রাজার কর্ণগোচর হইল, যেন প্রাসাদতল হইতে কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া রাজা তৎক্ষণাৎ নীচে আসিলেন। দেখিলেন এক সন্ন্যাসী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তখন ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিয়া নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনি কে, কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিলেন, আমার নিকট আপনার প্রয়োজনইবা কি। সন্ন্যাসী কোন উত্তর না করিয়া রাজাকে মুখব্যাদান করিতে কহিলেন। রাজা মুখব্যাদান করিবামাত্র সন্ন্যাসী থুৎকার উদ্গীরণ করিয়া রাজার মুখমধ্যে যেমন নিক্ষেপ করিবেন, রাজা অমনি ঘৃণাবশতঃ মুখ মুদ্রিত করিলেন। মুখনিক্ষিপ্ত থুৎকার রাজার চরণোপরি পতিত হইল। তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, রাজন্, আমি তোমাকে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া-ছিলাম। তুমি যে রাজ্যর নাম মুখে উচ্চারণ করিতে সেই রাজ্যই তোমার হইত। যাহা হউক এক্ষণে থুৎকার তোমার পদে পতিত হইয়াছে, আমি বলিতেছি তুমি যে রাজ্যে পদার্পণ করিবে সেই রাজ্যই তোমার অধীনস্থ হইবে। এই বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। তিনি যে কে, কোথা হইতেইবা আসিয়াছিলেন, তাহা রাজা কিছুই

জানিতে পারিলেন না। অবশ্য, ঘটনানুসারে বুঝিতে পারিলেন, যে, তাঁহার অভীষ্ট-দেবতা স্বয়ং গোরখনাথই তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে পর রাজা বিস্মিতচিত্তে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার শয়ান হইলেন। ঘোরতর উদ্বেগ ও চিন্তায় সে রাত্রি জাগরণেই অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে রাজা ভ্রাতৃদ্বয় ও মন্ত্রীকে নিকটে আহ্বান করিয়া রাত্রের অদ্ভুত ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া, কর্ত্তব্য বিষয়ে পূর্ব্বদিনের উদ্দিষ্ট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। কুমারদ্বয় ও মন্ত্রী রাত্রির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ আপনি আর দ্বিধা করিবেন না, বিশ্বস্তচিত্তে অবিলম্বে যুদ্ধসজ্জা করুন, নিশ্চয়ই গোরখনাথ আপনাকে বিজয়ভাগী করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম চিরকালই বলবান এবং ধর্ম্মের সর্ব্বত্রেই জয়। ধর্ম্মবীর রাজা পৃথ্বীনারায়ণ ধর্ম্মবুদ্ধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঘোর পাষণ্ড জয়প্রকাশের সমুচিত দণ্ড করিয়া নিপীড়িত নিরীহ নেপালবাসী দিগকে অসহ্য অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কল্পনা করিয়া ছিলেন, সুতরাং ধর্ম্ম তাঁহার সম্পূর্ণ সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। দৈব ঘটনা-ক্রমে বিবিধ সুযোগ অযাচিত ও অতর্কিতভাবে আসিয়া রাজা পৃথ্বীনারায়ণের হস্তগত হইতে লাগিল। যে সময় ভ্রাতৃত্রয় ও অমাত্য একত্র মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যচিন্তা করিতে ছিলেন,

সেই সময় প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাজ, দীর্ঘসিংহের দূত আসিয়া ভবৎসাক্ষাৎ জন্য দ্বারে উপস্থিত, এক্ষণে মহারাজের আদেশ প্রার্থনীয়। রাজা শুনিয়া দূতকে সমীপে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। দূত প্রবিষ্ট হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক রাজাকে দীর্ঘসিংহের লিপি অর্পণ করিল। নৃপতি পত্রিকা উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, রাজা দীর্ঘসিংহ লিখিয়াছেন, বৎস, আমি জরাক্রান্ত হইয়াছি। এ অবস্থায় রাজ্যভার বহন করিতে আমার শক্তিও নাই। কিন্তু ভগবান্, আমাকে নিঃসন্তান করিয়াছেন, সুতরাং পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবসর লওয়া মৎপক্ষে অসম্ভব। এইজন্য কামনা করিয়াছি, তুমি যদি অনুকূল হইয়া তোমার এক ভ্রাতাকে আমায় দত্তক দান কর, তাহা হইলে আমি তাহাকে পুত্রক করিয়া তাহারই হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করি। নিতান্ত বাসনা হইয়াছে এই চরমদশায় পতিতপাবনী বারাণসীযাত্রা করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনায় জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত করিব। তোমরা তিনভ্রাতা যেরূপ বিবিধগুণে বিভূষিত, ও ধর্ম্মপরায়ণ তাহাতে তোমাদিগের এক জনের হস্তে এই রাজ্যভার অর্পণ করিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত মনে অবসর লইয়া ইহ জগতে ধর্ম্মভাগী ও যশস্বী হইতে পারিব। অনুরোধ করি আমার কামনা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

রাজা পত্র পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া মনে মনে ভক্তিভাবে ত্রিলোকনাথ গোরখনাথকে নমস্কার করিলেন। তৎক্ষণমাত্রে দ্বিতীয় চিন্তা দূর করিয়া তিনি

যুদ্ধযাত্রা পক্ষে উৎসাহী ও স্থির নিশ্চয় হইলেন। অনন্তর কনিষ্ঠ, কুমার শূর-প্রতাপকে লিপি প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে তুমি রাজা দীর্ঘসিংহের দত্তক পুত্রক হইয়া বৃদ্ধ রাজার কামনা পূর্ণ করত ভাগতকগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ কর। কুমার শূর-প্রতাপ লক্ষ্মণোচিত ভ্রাতৃস্নেহপূর্ণবচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, আর্য্য, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি ইহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হইব। কিন্তু সামান্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, আমি আপনার চরণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া, ইন্দ্রত্ব পদেও অভি-লাষী নহি। অতএব অধীনকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি আর এরূপ আদেশ করিবেন না। বিচক্ষণ রাজা পৃথ্বীনারায়ণ তৎ-কালে আর কোন কথা না কহিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ, এক্ষণে রাজা দীর্ঘসিংহের দূতকে লইয়া গিয়া যথাবিধি বিশ্রাম করাও, দেখিও যেন তাহার কোন কষ্ট না হয়। কুমার শূর-প্রতাপ রাজার আজ্ঞা পাইয়া মহাসমাদর করিয়া দূতকে বিশ্রামার্থ লইয়া গেলেন। এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গীন তুষ্টির জন্য বিবিধ আয়োজন করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজা, ভ্রাতা শূর-প্রতাপকে আহ্বান করিয়া পুন-র্ব্বার কহিলেন, ভ্রাতঃ, তোমাকে দূরে রাখিলে আমিও অসহ্য মনোবেদনা ভোগ করিব। কিন্তু এক্ষণে উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধি আমাদিগের প্রধান চিন্তার বিষয়। আমাদিগের রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং আমাদিগের সহায় সম্পত্তিও অল্প। বিজয়লাভ পক্ষে সহায়ই একমাত্র সাধন। তুমি ভাগতক-গ্রামের রাজা হইলে আমাদিগের সহায় বৃদ্ধি হইবে। এইজন্য আমার

বাসনা, যে তুমি রাজা দীর্ঘসিংহের পুত্রক হইতে স্বীকৃত হও। অমাত্য কালূপাঁড়েও এই বিষয়ে কুমারকে অনুরোধ করিলেন।

জ্যেষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, কুমার শূর-প্রতাপ অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাজা তখন কৃতজ্ঞতা সহকারে মহারাজ দীর্ঘসিংহকে এক প্রতিলিপি লিখিয়া নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। লিখিলেন, যে মহারাজের অভিপ্রায় ও আদেশানুসারে আমার সুযোগ্য দ্বিতীয় সহোদর কুমার শূর-প্রতাপকে সত্বরই আপনার রাজধানীতে প্রেরণ করিতেছি। তিনিই মহারাজের দত্তক হইবেন। অনন্তর এই লিপি দূতের হস্তে দিয়া তাহাকে মহা সমাদরপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

দূত প্রস্থান করিলে পর, কয়েকদিন পরে, রাজা অমাত্য কালুপাঁড়ের সুযোগ্য পুত্র দামোদর-পাঁড়েকে সঙ্গেদিয়া কুমার শূর-প্রতাপকে ভাগতক-গ্রামে প্রেরণ করিলেন। রাজা দীর্ঘসিংহ, মহানন্দে মহা সমাদরে ও সমারোহে শূর-প্রতাপকে অভ্যর্থনা করিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে বিধানানুসারে দত্তক গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। শূর-প্রতাপ ভাগতক গ্রামের রাজা এবং দামোদর পাঁড়ে তাঁহার মন্ত্রী হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুমার শূর-প্রতাপ ভাগতক-গ্রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে পর, রাজা পৃথ্বীনারায়ণ জয়প্রকাশের প্রতিকূলে যুদ্ধার্থ

সজ্জিত হইলেন। ভ্রাতা শূর-প্রতাপকে অবসর ক্রমে নেপাল আক্রমণ করিবার আদেশ দিয়া, রাজা নিজ সেনাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যাত্রা করিলেন। এক ভাগ নেপালের উত্তর ও আর এক ভাগ দক্ষিণ বেষ্টন করিয়া যাত্রা করিল। আর এক ভাগ সাক্ষাৎ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিল। কুমার দলমর্দ্দন উত্তরবাহিনী ও অমাত্য কালুপাঁড়ে পূর্ব্ববাহিনী সেনার অধিনায়ক হইলেন। স্বয়ং রাজা দক্ষিণবাহিনী সেনা-চয়ের আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক সেনার সংখ্যা পাঁচ পাঁচ শত, সকলেই পদাতিক। অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর এক প্রকার তাৎকালিক দেশীয় বন্দুক, ভোজালিয়া ও কৃপাণ মাত্র। সাহস, শৌর্য্য ও দৈহিক বল ভিন্ন কোন বিশেষ যুদ্ধ-কৌশলে তাহারা শিক্ষিত ছিল না। জয়-প্রকাশের সৈন্যের শিক্ষা ও অস্ত্র শস্ত্রাদি একই প্রকার ছিল। কিন্তু সংখ্যা, পৃথ্বীনারয়ণের সৈন্যের সংখ্যা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক ছিল। সৈন্যবল অল্প হইলেও রাজা পৃথ্বীনারয়ণ সোৎসাহে ও বিশ্বস্তচিত্তে বিজয়ের আশায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কারণ তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহার প্রত্যেক সৈনিকের দেহে যুদ্ধে অপরাজিত, গর্ব্বিত, ও অরাতিসংহারক ক্ষত্রতেজ প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল এবং সকলেই শূর, ধর্ম্মবুদ্ধি, কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত ও দুর্ব্বৃত্তশত্রুর শোণিত দর্শনে লোলুপ হইয়াছিল। কুমার দলমর্দ্দন, অমাত্য কালুপাঁড়ে এবং নিজের শৌর্য্য, বীর্য্য, সমর-কৌশল এবং যোগ্যতাদি বিষয়েও, তাঁহার সমুচিত জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে তাঁহার এক এক

সৈনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়প্রকাশের সহস্র সৈনিকেরও অধিক হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। অতএব কুণ্ঠিত না হইয়া ইষ্ট দেবদেবী গোরখনাথ ও মনকামনার অর্চ্চনান্তে বিধিবিহিত বিবিধ মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া সোৎসাহচিত্তে আগ্রহ-সম্পন্ন ও প্রফুল্ল-সেনা সমভি-ব্যাহারে এক দিনেই তিন জনে পূর্ব্বোক্ত তিন পথে বহির্গত হইলেন। রাজা পৃথ্বীনারায়ণের বিচক্ষণতা-প্রতিপাদিত প্রত্যয়ের অবিকল অনুরূপ ফল ফলিয়াছিল, তাহা আমরা পরে সম্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুমার দলমর্দ্দন উত্তর পথে গমন করিয়া নয়িকোট-গড়ি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। নয়িকোটগড়ি কাট-মুণ্ড হইতে দশক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। রাজা জয়প্রকাশের প্রাপ্তদুর্গের মধ্যে নয়িকোটগড়ি সর্ব্ব প্রধান দুর্গ ছিল। সুতরাং অধিক সংখ্যক সৈন্য এই দুর্গরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কুমার দলমর্দ্দন এই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ক্রমা-গত পঞ্চদশ দিবস উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং জয়লক্ষ্মী নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পঞ্চদশ দিবসের পর লক্ষ্মী নেপালী সেনার পক্ষে কিঞ্চিৎ দোলায়িত হইলেন। দলমর্দ্দনের সেনা অভিহত হইয়া কিয়দ্দূর প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। এই সময় গুলি লাগিয়া কুমার দলমর্দ্দন রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। সুতরাং সৈন্যমধ্যে সহসা ভীতি, ক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত

হইল। যুদ্ধও স্থগিত হইল। ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ এবং অমাত্য কালুপাঁড়ে শোকে ও ক্ষোভে অভিভূত হইলেন। রাজ্যের যাবদীয় সেনা এবং প্রজাবর্গ ও যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ উদ্‌যোগী বীরপুরুষের ক্ষোভ এবং শোক ক্ষণপ্রভার ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ক্ষণ পরেই লোপ প্রাপ্ত হয়। দলমর্দ্দনের নিধনে উৎসাহ, ভগ্ন না হইয়া বরং অধিকতর পরিবর্দ্ধিতই হইয়া উঠিল। রাজা হইতে সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত সকলেই ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যেকে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করিলেন, নেপাল রাজ্য অবশ্যই আত্মসাৎ করিতে হইবে, এবং তদনুযায়ি উৎসাহসম্পন্ন হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কুমার দলমর্দ্দনের সেনা অবিলম্বেই একত্রীভূত হইয়া কালোচিত কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইল। পর্য্যালোচনার পর স্থির হইল সেনা-নায়ক রণপতিত হইলেন বলিয়া, আমাদিগের নিরুৎসাহ ও ভীত হইবার কোন কারণই নাই। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, আমরা ততক্ষণ সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইব না। এইরূপ স্থির করিয়া পুনর্ব্বার আগ্রহ সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে কালুপাঁড়ে সাক্ষাৎ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া মানেচৌকী নামক এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। মানেচৌকী কাটমুণ্ড হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে জয়প্রকাশের বহুতর সৈন্যের সহিত কালুপাঁড়ের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষে ক্রমাগত দশ দিবস যুদ্ধ হইল, কিন্তু কোন পক্ষেই জয়-পরাজয় লক্ষিত হইল না। দশম

রাত্রিতে সমরনিপুণ কালুপাঁড়ে সহসা রাত্রিযোগে নেপালী সেনাকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত সৈনিকের প্রাণসংহার করিলেন। প্রাণীমাত্রও নিষ্কৃতি পাইল না।

এইরূপে অসাধারণ শৌর্য্য ও বীর্য্য সহকারে মানে-চৌকী অধিকার করিয়া কাপুপাঁড়ে ঐ স্থান রক্ষার্থ সমুচিত আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে কুমার দল-মর্দ্দনের নিধনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন। বার্ত্তাপ্রাপ্ত হইবামাত্র, মানেচৌকী রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্টসৈন্য লইয়া নয়িকোটগড়ি যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দলমর্দ্দনের সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন, এবং একত্রিত হইয়া ঘোরতর আগ্রহ সহকারে যুদ্ধ আরম্ভ করি-লেন। নেপালী সেনা অবিলম্বেই পরাজিত হইয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইল, এবং ছয় ক্রোশ দক্ষিণে বালাজু দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইল। কালুপাঁড়ে অবিলম্বেই অনুসরণ করিয়া বালাজু অবরোধ করিলেন। উভয়পক্ষে পুনর্ব্বার যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ দক্ষিণাভিমুখে অভিগমন করিয়া ধূনি-বেশী নামক স্থানে জয়প্রকাশের সেনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধূনীবেশা কাটমুণ্ড হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এইস্থানে উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরব্ধ হইল। দশ-ঘণ্টাকাল যুদ্ধের পর জয়লক্ষ্মী রাজার অঙ্কশায়িনী হই-লেন। নেপালী সেনা পলায়ন করিয়া চারি ক্রোশ উত্তরে ফরপিং নামক এক ক্ষুদ্র দুর্গে আশ্রয় লইল। রাজাও অনু-সরণ করিয়া এ দুর্গও অবরোধ করিলেন। ত্রয়োদশ দিবস

যুদ্ধের পর ফরপিং রাজা পৃথ্বীনারায়ণের হস্তগত হইল। পৃথ্বীনারয়ণ ফরপিং অধিকার করিয়া উহার রক্ষার্থ আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ অহঙ্কৃত দুর্ব্বৃত্ত জয়প্রকাশ, স্বীয় অধিকতর সহায় ও প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত মনে কাটমুণ্ডের প্রাসাদে থাকিয়া ইন্দ্রিয়-সেবা করিতে ছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, যে তাঁহার সেনা সর্ব্বত্রই ক্রমান্বয়ে অতি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইয়াছে এবং ফরপিং ও নয়িকোটগড়ি শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্রাশয় কাপুরুষ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্বীয় নগর ও প্রাসাদ রক্ষার্থ সামান্য কতিপয় প্রহরী রক্ষা করিয়া নিজ সমগ্র সেনা লইয়া কীর্ত্তিপুর দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কীর্ত্তিপুর কাটমুণ্ডের সার্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এইটী নেপালের তাৎকালিক প্রধান দুর্গ। ইহা একটী গিরিদুর্গ এবং চতুর্দ্দিকে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। রাজা জয়প্রকাশ আত্মরক্ষার্থ এই দুর্গে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ এই সংবাদ পাইয়া ফরপিনে কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহার লইয়া কীর্ত্তিপুর অবরোধ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শূর-প্রতাপ চরদ্বারা এতদিন অবসর অন্বেষণ করিতে-ছিলেন। জয়প্রকাশ কাটমুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তিপুরে

প্রস্থান করিয়াছেন, শুনিবামাত্র সসৈন্যে আগমন করিয়া, জয়প্রকাশের রক্ষিত সামান্য সেনাকে পরাজয় ও সংহার করিয়া অনায়াসেই কাটমুণ্ড অধিকার করিলেন। কাটমুণ্ড অধিকার করিয়াই তথায় অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া কালুপাঁড়ের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত বালাজু অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং বালাজুস্থিত নেপালী-সৈন্যের পৃষ্ঠভাগে আক্রমণ করিলেন। ক্ষীণবল নেপালীসৈন্য এইরূপে উভয়দিকে আক্রান্ত হইয়া সহজেই পরাজিত ও বিনষ্ট হইল। কালুপাঁড়ে ও শূরপ্রতাপ বালাজু অধিকার করিয়া তাহার রক্ষার্থে তথায় সৈন্য স্থাপন করিয়া উভয়ে কাটমুণ্ড আগমন করিলেন, এবং তথায় রক্ষা ও শাসনের সমস্ত আয়োজন করিরা কার্য্য নির্ব্বাহার্থ দামোদরপাঁড়েকে রাখিয়া, দুইজনে স্ব স্ব সৈন্য লইয়া কীর্ত্তিপুরে যাইয়া রাজা পৃথ্বীনারায়ণের সহিত যোগ দিলেন। এক্ষণে সমস্ত গোরখাসৈন্য একত্রিত হইয়া কীর্ত্তিপুর আক্রমণ করিল। ক্রমাগত নয় মাস যুদ্ধের পরে অসাধারণ শূরসিংহ বিক্রমশালী কালুপাঁড়ে অগ্রসর হইয়া দুর্গদ্বার ভেদ করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। উভয়সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই তুমুল সংগ্রামে রাজা জয়প্রকাশ এবং কালুপাঁড়ে সংগ্রামক্ষেত্রে শয়ান হইলেন। জয়লক্ষ্মী রাজা পৃথ্বীনারয়ণের অঙ্কশায়িণী হইলেন। ঐ মুহূর্ত্তেই সমগ্র নেপাল রাজ্য পৃথ্বীনারাণের অধিকৃত হইল। রাজা জয়প্রকাশের মৃত্যুর পর, রাজা পৃথ্বীনারাণের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, নেপালে এরূপ ব্যক্তি মাত্রও রহিল না। কীর্ত্তিপুর দুর্গ অধিকার করিয়া পৃথ্বী-

নারায়ণ ভ্রাতা শূরপ্রতাপের সমভিব্যাহারে কাটমুণ্ড প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মযুদ্ধে দুর্ব্বৃত্ত জয়প্রকাশ পরাজিত ও নিহত হইল এবং মহাত্মা পৃথ্বীনারায়ণ বিজয়ী হইলেন। সেই সময় হইতেই নেপাল রাজ্য গোরখাজাতির অধিকৃত হইল। নেপালের প্রজাবর্গ অত্যাচারী নরপিশাচ জয়প্রকাশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হওত কৃতজ্ঞতা সহকারে রাজা পৃথ্বীনারায়ণকে আপনাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা ও রাজা বলিয়া অভিবাদন করিল। সুতরাং যুদ্ধজয়ই রাজা পৃথ্বী-নারায়ণের চরম জয় হইল। সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য তাঁহাকে আর কোন আয়াসই পাইতে হইল না। কাটমুণ্ড প্রবেশের পরেই গোরখগ্রাম হইতে সিংহাসন উঠাইয়া ঐ স্থানে আনাইলেন এবং গোরখগ্রাম ও নেপাল এই উভয় রাজ্য একত্রিত করিয়া নেপালরাজ্য নাম দিয়া কাটমুণ্ডকে ঐ রাজ্যের রাজধানী করিলেন।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ বিজয়ী হইলেন সত্য, কিন্তু বিজয়ে তিনি আশানুরূপ সুখী হইতে পারিলেন না। প্রিয় কণিষ্ঠ-সহোদর কুমারদলমর্দ্দন ও অমাত্য কালুপাঁড়ের নিধন ঘটনা শল্যসম বিদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল। বিশেষ কালুপাঁড়ের জন্য রাজা নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন। বিচক্ষণ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, ও শূর কালুপাঁড়ে রাজার স্বর্গীয়পিতার সময় হইতে অমাত্যের কার্য্য করিয়া আসিতে-

ছিলেন। তিনি যেমন সুযোগ্য তেমনি প্রভুভক্ত ও রাজ-কুলের হিতকারী ছিলেন। সুতরাং এক কালুপাঁড়ের নিধনে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, বহুদর্শী, উদারচেতা উপদেশক, অনুরক্ত মিত্র, এবং প্রধান সহায় হারাইলেন। অমাত্যের নিধনে নেপাল রাজ্যেরও যথেষ্ট হানি হইল। তাঁহার মন্ত্রণা ও তত্ত্বাবধারণে নবোপার্জ্জিত, নবসংগঠিত নেপালরাজ্যের অচিরেই সুচারু-সমুন্নতি ও বিবিধ সুখ বৃদ্ধি হইতে পারিত।

যাহাহউক, কর্ত্তব্য-পরায়ণ মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ, সহজ-গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতাগুণে অচিরেই ব্যাকুলতা নিবারণ করিয়া স্থিরভাবে উদ্‌যোগ সহকারে সুশাসন সংস্থাপন ও রাজ্যের কুশল ও সুখ বৃদ্ধিপক্ষে যত্নবান হইলেন। প্রথমতঃ অভীষ্ট দেব-দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া দেবী-মনকাননার মন্দির স্বর্ণছাদে মণ্ডিত এবং দেব গোরখনাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শে ধর্ম্মশালা, নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সমারোহে তাহাদিগের সেবা-সংবাহনের জন্য প্রচুর উপস্বত্বের রাজভূমি ও দেবোত্তর বন্দবস্ত করিয়া দিলেন।

পরে রাজ্যগঠনে মনোযোগী হইলেন। কুমার শূরপ্রতাপকে ভাগতকগ্রামের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া পূর্ব্বরাজ্যের আধিপত্য করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রবর শূরপ্রতাপ, তাহাতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না। ভাগতক-গ্রাম, নেপালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, স্বয়ং ভ্রাতৃসেবার্থে কাটিমুণ্ডে থাকিয়া শাসনকার্য্যে ভ্রাতার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দামোদরপাঁড়ে অমাত্য পদে-প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ প্রথমতঃ একীভূত নেপাল, গোরখগ্রাম ও ভাগতকগ্রাম রাজ্যের, ভূমি নির্ণয় করিয়া সমগ্র ভূমির কর ৫২ লক্ষমুদ্রা নির্দ্ধারণ করিলেন। রাজ্যরক্ষার্থ সেনাও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি এবং সৈনিকদিগের সুশিক্ষার তৎকালোচিত সুব্যবস্থা করিলেন। সৈনিকেরা পূর্ব্বে যে বন্দুক ব্যবহার করিত, তাহার রঞ্জুদঘরে হস্তে করিয়া অগ্নি প্রয়োগ করিতে হইত। পৃথ্বীনারায়ণ এক্ষণে পাথুরিয়াবন্দুক নির্ম্মাণ করাইলেন। এতাবৎ নেপালে কোন মুদ্রা মুদ্রিত হইত না। হিন্দুস্থানের মুসলমানদিগের মুদ্রা ও তিব্বতী-মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। রাজা পৃথ্বীনারায়ণ টাকশাল স্থাপন করিয়া সর্ব্ব প্রথমে নেপাল-রাজ্যে মুদ্রা মুদ্রিত করিলেন। বিচারার্থ কোনরূপ ধর্ম্মাধি-করণও ছিল না। এক্ষণে ইটাচাপলী,কোটিলিং ও টাকশাল নামে তিনটী বিচারালয় স্থাপিত হইল, এবং আর্য্যস্মৃতির অনুসারে কতকগুলিন ব্যবস্থাও সংগ্রহ করিয়া বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত করা হইল।

নেপালবিজয়ের একবৎসর পরে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ পুত্র-মুখ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। সিংহপ্রতাপ নামে কুমারের নামকরণ করা হইল। কুমার সিংহপ্রতাপ একাদশ বৎসরে পদার্পণ করিলে পর তানসিনের অধিপতি বৃদ্ধরাজা মুকুন্দ-সেন কুমার সিংহপ্রতাপকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদানার্থ প্রার্থী হইলেন। মুকুন্দসেন রাজা পৃথ্বীনারায়ণের সমজাতীয় ছিলেন। ঐ একমাত্র দুহিতা ব্যতীত তাঁহার আর অপত্য ছিল না। রাজা পৃথ্বীনারাণ মুকুন্দসেনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তদীয় কন্যাকে মহা সমারোহে পুত্রবধু গ্রহণ করিলেন

অপুত্রক মুকুন্দসেনের রাজত্ব ও পরে নেপালরাজ্যে ভুক্ত হইল।

পুত্রের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবার অনতি পরেই ভূপতি পৃথ্বীনারায়ণ মৃগয়ার্থ মহিষী সমভিব্যাহারে নয়িকোটগড়ির সন্নিহিত অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় প্রতিদিন বিবিধ মৃগ সংহার করিয়া একমাস কালযাপন করিলেন। অনন্তর এক-দিন রাজা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইতিমধ্যে অরণ্য হইতে সহসা এক ভীষণ ব্যাঘ্র বহির্গত হইয়া রাজার সম্মুখীন হইল। রাজা কখন গুলি বা বাণাদি অন্য কোনরূপ ক্ষেপনীয় অস্ত্রদ্বারা ব্যাঘ্র নিধন করিতেন না, কিন্তু সম্মুখ সমরে স্বহস্তে অসিদ্বারা সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নিধন সাধন করাই তাঁহার অভ্যাস ছিল, সুতরাং দর্শনমাত্রে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশিচর্ম্ম হস্তে অগ্রসর হইয়া ব্যাঘ্রের শরীরে অসিঘাত করিলেন। ব্যাঘ্রও লম্ফপ্রদান করিয়া তাঁহার উপর পতিত হইল, এবং তাঁহাকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। সমভিব্যহারী অনুচরেরা আসিয়া তৎক্ষণমাত্রে ব্যাঘ্রকে সংহার করিল, কিন্তু অবস্থা দর্শনে বোধ হইল রাজার জীবনের আর কোন আশা নাই। তখন সমভিব্যাহারিণী রাজ্ঞী ত্রিপুরাসুন্দরী সদ্গতি সম্পাদানার্থ ভর্ত্তাকে পুণ্যনদী ত্রিশূলগঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া দেবর শূরপ্রতাপকে বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। শূরপ্রতাপ তথায় উপস্থিত হইলে পর রাজা পৃথ্বীনারায়ণ স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন সাধ্বী ত্রিপুরা সুন্দরী সহমরণে সংকল্প করিয়া দেবরকে আদেশ করিলেন, আমি পতির অনুগামিনী হইলাম, তুমি এই স্থানে

এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বার্ষিক লক্ষ মুদ্রার উপস্বত্ব ভূমি দেবোত্তর করিয়া দিবে। তদনন্তর রাজার সংস্কারের সংকল্প হইল, রাজ্ঞী ঐ চিতায় আরোহণ করিয়া ভর্ত্তার অনুগামিনী হইলেন।

আদেশানুসারে রাজা শূরপ্রতাপ অবিলম্বেই ঐ স্থানে ত্রিপুরেশ্বর নামে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এক অতিথি-শালা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের অতিথিশালায় অদ্যাপি প্রতিদিন ৪।৫ শত সন্ন্যাসী ও অতিথি আহার করে ও প্রত্যেকে গাঞ্জার নিমিত্ত নগদ চারি পয়সা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ লোকান্তরিত হইলে পর একাদশ-বর্ষীয় কুমার সিংহপ্রতাপকে সিংহাসনে অভিষেক করিয়া রাজা শূরপ্রতাপ রাজ্য করিতে লাগিলেন। তদীয় রাজত্ব কালে কোন বর্ণনীয় ঘটনাই উপস্থিত হয় নাই। ছয় বৎসর রাজত্বের পর রাজা সিংহপ্রতাপ অকালে কাল কবলে প্রবেশ করিলেন।

সিংহপ্রতাপের মৃত্যু হইলে পর ইং ১৭৭৬ অব্দে তদীয় অপ্রাপ্ত-বয়স্ক কুমার রণবাহাদুর নেপালের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, এবং রাজা শূরপ্রতাপ প্রধান অমাত্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। চারি বৎসর পরে (১৭৮০) শূরপ্রতাপ গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং বহু চিকিৎসায় জীবনসংশয়

স্থির করিয়া দামোদর পাঁড়ের হস্তে শাসন ভার সমর্পণ করিয়া কাশীধাম যাত্রা করিলেন। দামোদর পাঁড়ে রণ-বাহাদুরের অপ্রাপ্তব্যবহার কালে স্বয়ং শাসন কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে রাজা বয়স প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজা রণবাহাদুর, বিনয়, দয়া, দাক্ষিণ্য, শৌর্য্যবীর্য্যাদি বিবিধ গুণে প্রজামণ্ডলীর বহুল আশা বর্দ্ধন করিলেন। নিয়ত অবিচলিত চিত্তে উদ্যোগী হইয়া প্রজাপালনে নিরত রহিলেন। রাষ্ট্রমধ্যে তাঁহার সুযশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিলেন। তিনিও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজার লালনপালন করিতে লাগিলেন। নেপাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই কুশল ও খ্যাতি বিরাজ করিতে লাগিল।

১৮০২ সালে নেপালকে তিব্বতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। লাসা নগরে নেপাল রাজ্যের এক কুঠী ছিল। লাসা হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় করিয়া নেপালে প্রেরণ এবং নেপালের বাণিজ্যদ্রব্য তথায় বিক্রয় করা কুঠীর কার্য্য ছিল। কোন দোষে তিব্বতরাজ কুঠীরের এক-জন কর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড করিলেন। এই সংবাদ নেপালে উপস্থিত হইবা মাত্র রাজা রণবাহাদুর তিব্বতের প্রতি-কূলে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেনা যুদ্ধযাত্রায় সজ্জিত হইল। বম্‌সাহা নামে এক বীরপুরুষ অধিনায়ক হইলেন। যুদ্ধঘোষণা ও সেনা সজ্জিত হইল বটে, কিন্তু যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, তৎকালে রাজকোষের এরূপ অবস্থা ছিল না। সুতরাং রাজা রণ-বাহাদুরকে রাজকীয় ভূমি বন্ধক রাখিয়া সমৃদ্ধ

প্রজাদিগের নিকট অর্থ গ্রহণ করিতে হইল। এইরূপে অর্থ সংগৃহীত হইলে পর সেনাপতি বম্‌সাহা অষ্ট সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তৎকালীন উভয় রাজ্যের সীমাভূত রস্থয়ানদীর তীরে উভয় সৈন্যর সাক্ষাৎ হইল। ফিঙ্গা ও সামান্য কাতান ভিন্ন তিব্বতী সৈন্যের অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। গোরখা সৈন্যেরা পাথুরিয়া বন্দুক, অসি, চর্ম্ম ও ভোজালিয়া অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। সুতরাং গোরখা সৈন্য অনায়াসেই জয় লাভ করিল। তিব্বত পক্ষে বহুল সৈনিক রণভূমে শয়ান হইল। অবশিষ্ট সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কেরু নামক এক নগরে আশ্রয় লইল। বম্‌সাহা কালবিলম্ব না করিয়া কেরুতে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দশ দিবস যুদ্ধের পর তিব্বতী সেনা পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরস্থিত ডিগরচা নগরে যাইয়া আশ্রয় লইল। ডিগরচা তিব্বতের এক প্রধান নগর ও দুর্গ। সেনাপতি বম্‌সাহা পুনর্ব্বার অনুসরণ করিয়া ডিগরচা অবরোধ, এবং অবিলম্বেই পুনর্ব্বার তিব্বতী সেনাকে পরাজয় করিয়া ডিগরচা অধিকার করিলেন। পরাজিত অবশিষ্ট তিব্বতী সেনা ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া লাসা নগরে আশ্রয় লইল। বম্‌সাহা, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মপুত্রের পারে গমন করা নিষিদ্ধ বলিয়া, আর অনুসরণ করিতে পারিলেন না। ডিগরচা অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়া ঐ স্থানেই অবস্থিত হইলেন। লুণ্ঠনে প্রচুর সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লব্ধ হইলেন। যুদ্ধে জয় হইল বটে, কিন্তু বম্‌সাহা জয়ে হানি ভিন্ন কোন লাভই দেখিলেন না। অস্ত্রমুখে না হউক, তুহিন গিরির দুরন্ত দুঃসহ নীহারে

বহুতর গোরখা সৈন্য নিহত ও পীড়িত হইতে লাগিল। আহার সামগ্রীও সম্পূর্ণ অভাব হইয়া উঠিল। গোরখা সৈন্যের আগমনের পূর্ব্বেই, কি গ্রামবাসী কি নগরবাসী যাবদীয় তিব্বতীয় প্রজা পলাইয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়াছিল। সুতরাং সমস্ত প্রদেশ ভীষণ মরুর ন্যায় পতিত ছিল। এতাদৃশ অবস্থায় ডিগরচায় অবস্থিতি করা নিষ্প্রয়োজন ও মারাত্মক স্থির করিয়া বম্‌সাহা ঐ অর্থে নেপালে সংবাদ পাঠাইলেন। রাজা রণবাহাদুর এই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া লাসার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত বমসাহাকে আদেশ প্রেরণ করিলেন। পরাজিত লাসারাজ স্বয়ং সন্ধির জন্য লোলুপ ছিলেন, এক্ষণে নেপালের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়া আগ্রহসহকারে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধিতে স্থির হইল (১) হিমালয় উভয় রাজ্যের সীমা হইবে, (২) লাসায় নেপাল রাজের এক জন কার্য্যসচিব ও নেপাল রাজ্যের দ্বাত্রিংশৎ কুঠী থাকিবে। তিব্বতরাজ কুঠীর টেক্স লইতে পারিবেন না। লাসাস্থিত গোরখাদিগের কোন মোকদ্দমা তিব্বত বিচারালয়ে না হইয়া, তত্রস্থ নেপাল সচিবের দ্বারা নিষ্পাদিত হইবে।

এইরূপে তিব্বত-সমর শেষ ও সন্ধি সংস্থাপন করিয়া বিজয়ী বম্‌সাহা কাঠমুণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল পরে চীনরাজের এক দূত কাঠমুণ্ড দরবারে উপস্থিত হইয়া চীনরাজের অধীনস্থ তিব্বতরাজ্যের সহিত যুদ্ধ ও রাজ্যের কিয়দংশ অপহরণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিলেন। অন্যথা যুদ্ধ প্রস্তাব করিলেন। রাজা রণবাহাদুর প্রবল পরাক্রান্ত চীন

রাজের সহিত যুদ্ধ অপ্রযুক্ত বিবেচনা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। চীনদূত স্বীকৃত হওয়াতে স্থির হইল, অধিকৃত নূতন রাজ্যের জন্য নেপালরাজ চীনের অধীনতা স্বীকার, এবং সেই অধীনতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত, প্রতি পঞ্চম বৎসর দ্বাত্রিংশৎ ব্যক্তিদ্বারা চীন-সম্রাটের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিবেন। এইরূপ সন্ধিস্থাপন করিয়া চীনদূত প্রস্থান করিলেন।

যুদ্ধকাণ্ড সর্ব্বাংশে নিষ্পাদিত হইলে পর, রাজা রণবাহাদুর পুনর্ব্বার রাজ্যের আভ্যন্তরীক কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তিব্বতের সহিত যুদ্ধে লুণ্ঠনদ্বারা যে প্রভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য লব্ধ হইয়াছিল, রাজা তদ্দ্বারা বন্ধক-ভূমি উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু যাঁহাদিগের নিকট বন্ধক ছিল, তাঁহারা বন্ধকী ভূমির প্রভূত লাভ দর্শন করিয়া সকলে একমত হইয়া ভূমি প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। প্রবল প্রজার প্রতি বল প্রয়োগ করিলে, সিংহাসন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে ভাবিয়া, রাজা অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন। সেই অবধি ঐ সকল ভূমি প্রজাদিগেরই হইল। এই সকল ভূমিই নেপালে রাজবান্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজা রণবাহাদুরের সুশাসনে নেপালবাসী পরমানন্দে ও সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জগতের সুখ ক্ষণিক। দৈব-দুর্ব্বিপাক-বশতঃ এক দুর্ঘটনা উপস্থিত

হইয়া নেপালরাজ্যকে ভীষণ বিপদগ্রস্ত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

রাজা একদা দেব পশুপতিনাথের দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। দৈবক্রমে এক অলৌকিক রূপসম্পন্না যুবতী কামিনী ঐ সময়েই মন্দিরে আসিয়াছিলেন। রাজ্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ রমণী-দর্শনে রাজার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় স্বাভাবিক চরিত্র ও অসাধারণ গুণগ্রাম বিস্মৃত হইয়া ঐ রমণীরত্ন-লাভার্থ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ঐ রমণী কোথায় অবস্থিতি করে জানিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ একজন অনুচরকে আদেশ করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অবিলম্বেই দূত আসিয়া সংবাদ দিল, যে ঐ কামিনী একজন মৈথিল ব্রাহ্মণের দুহিতা। ঐ ব্রাহ্মণ এক্ষণে ভাগতক-গ্রামে বসতি করিয়াছেন। ভাগতক-গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ যুবার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মনোহারিণী এক ব্রাহ্মণকন্যা,তাহাতে আবার বিবাহিতা, শ্রবণ করিয়া, রাজা রণবাহাদুর তাঁহার প্রাপ্তিবিষয়ে হতাশ হইয়া বিসংজ্ঞের ন্যায় হইলেন। প্রদীপ্ত পূর্ব্বরাগ, দিবস যামিনী তাঁহার অন্তঃপ্রবাহ শোষণ করিতে লাগিল। সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্তের ন্যায় তিনি প্রতিদিন ম্লান ও শীর্ণ হইতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠিল।

রাজার বয়স্যগণের মধ্যে ভীম-সিংহ-থাপা নামে একজন যুবক ছিলেন। ইহাঁর যোগ্যতাদি বিষয়ে পাঠক অব্যবহিত পরেই বিশেষ পরিচয় পাইবেন। এই ভীমসিংহ, বৃত্তান্ত

জ্ঞাত হইয়া, প্রথমতঃ রাজাকে এই অন্যায় ও অধর্ম্ম বাসনা হইতে বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন, কিন্তু রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয় ও জীবনাশঙ্কা প্রত্যক্ষ করিয়া অবশেষে তাঁহার সহায় হইলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, মহারাজ, একে প্রজার পত্নী, ও জাতিতে ব্রাহ্মণী, হরণ করা মহারাজের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত ও অধর্ম্মজনক জানিয়াও, যদি মহারাজ ঐ কামিনী লাভার্থ এতই প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, তজ্জন্য মহারাজের এতাদৃশ কাতর ও উদ্বিগ্ন হইবার কোন প্রয়োজনই করে না। আপনি নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হউন, আমি স্বয়ং যাইয়া যুবতীকে আনিয়া দিব।

রাজা, ভীম-সিংহের বচনে আশ্বস্ত হইয়া বিবিধ বিনয় বচনে ভীম-সিংহকে তাঁহার সহায় হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। ভীম সিংহ অনুরুদ্ধ হইয়া ভাগতক-গ্রামে ঐ কামিনীর পিতার নিকট গমনকরিয়া উদ্দিষ্ট কার্য্যের প্রস্তাব করিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রবণ করিয়াই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, কিন্তু অস্বীকারে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, ভীমের মুখে এই বিভীষিকা অবগত হইয়া উত্তর করিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বেই আমার কন্যাকে পাত্রসাৎ কবিয়াছি, অতএব তাহার উপর আমার কোন অধিকার নাই। আপনি সাক্ষাৎ কন্যার নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য প্রস্তাব করুন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।

ভীমসিংহ ব্রাহ্মণের কথা যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিয়া, কামিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। বুদ্ধিমতী সুচতুরা ব্রাহ্মণ-দুহিতা, হয় ধর্ম্মলোপ

না হয় আত্মহত্যা স্থির-নিশ্চয় বুঝিয়া পূর্ব্বপক্ষই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া ভীমসিংহকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি তোমাকে এ বিষয়ের কোন উত্তর দিতেই প্রস্তুত নহি। তুমি গিয়া মহারাজকে বল, তিনি যদি স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে পারিব। অন্যথা তাঁহাকে এ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে কহিবে।

ভীমসিংহ আসিয়া রাজাকে যথোক্ত নিবেদন করিলেন। রাজা রণবাহাদুর সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইলেন, এবং বয়স্য ভীমসিংহকে যথেষ্ট পুরস্কার করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে অবিলম্বেই ভাগতক-গ্রামে যাত্রা করিলেন। তথায় রাজা স্বীয় মনোমোহিনীর নিকট কাতর-বচনে প্রণয় প্রার্থনা করিলে পর, তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ আমি ব্রাহ্মণের দুহিতা ও পত্নী এবং কুলকামিনী। কিন্তু মহারাজ যখন আমার লাভার্থ এতাদৃশ আগ্রহসম্পন্ন হইয়াছেন, তখন আমার বাচ্যান্তর নাই। কিন্তু ইতি পূর্ব্বে আমার নিকট কতকগুলিন সত্য করিতে হইবে। মহারাজ যদি সেই সত্যগুলিন অনুমোদন ও যথাবৎ পালন করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তিই থাকিবেক না। মূঢ় রণবাহাদুর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, তুমি অবিলম্বে স্বীয় প্রার্থিতব্য ব্যক্ত করিয়া আমাকে সুখী কর।

যুবতী কহিলেন, রাজন্ আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে, আপনি আমার পরিণেতা ব্রাহ্মণের ভরণ পোষণার্থ বার্ষিক

পঞ্চাশৎ সহস্র উপস্বত্বের ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, দ্বিতীয়, আমার পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের জন্য, দেব জগন্নাথদেবের এক মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করাইয়া এইরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, যে দেবস্ব হইতে প্রতিবর্ষে দুই সহস্র ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে এক এক শত মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। তৃতীয়, আমার গর্ভজাত সন্তানই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। চতুর্থ, আপনার বর্ত্তমান মহিষীকে ভবন হইতে দূর করিয়া দিবেন। পঞ্চম, আপনি আমা ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিতে পারিবেন না।

রাজা রণবাহাদুর এই সকল প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। সত্যানুসারে রাজ্ঞী অন্তঃপুর হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া কাঠমুণ্ডের উত্তর ধৈফু নামক স্থানে প্রেরিত হইলেন। তথায় তাঁহার জন্য এক বাটী নির্ম্মাণ ও প্রহরীনিয়োগ হইল এবং ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণকুমারী অবরোধের অধিষ্ঠাত্রী হইলেন।

যে বন্দোবস্তে ব্রাহ্মণীকে আনয়ন করা হইয়াছিল, পরে মন্ত্রীসাক্ষাৎ সমস্ত গোচর করান হইল। ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মভীরু স্বাধীন-স্বভাব প্রধান-মন্ত্রী দামোদর-পাঁড়ে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইলেন। উক্ত কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না, এবং অপকর্ম্ম জন্য রাজাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। রাজা রণবাহাদুরের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছিল, তিনি নিষ্কামমিত্র দামোদরকে

শত্রুস্থান করিয়া ক্রোধে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। ঐ মুহূর্ত্তেই ভীমসিংহ প্রধান-অমাত্য-পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন।

এই রূপে অভীষ্টলাভ ও কণ্টক দূরীকৃত করিয়া, রণবাহাদুর নিশ্চিন্তচিত্তে ইন্দ্রিয়-সুখে নিরত হইলেন। রাজকার্য্য সমস্ত ভীমসিংহের হস্তে সমর্পণ করিয়া অহর্নিশা অন্তঃপুরেই নিবদ্ধ রহিলেন। প্রতিশ্রুত অন্যান্য সত্যও অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল। জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়া প্রতিজ্ঞামত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করা হইল। অদ্যাপি নেপালে এই বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। দুই বৎসর পরে এই ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে এক নবকুমার জন্মিল। রাজা তাহার নাম-করণ করিলেন গীর্ব্বাণবিক্রম।

কুমার গীর্ব্বাণবিক্রম ভূমিষ্ঠ হইবার দুই বৎসর পরে নৃশংস মৃত্যু রাজা রণবাহাদুরের সুখশশী গ্রাসকরিয়া নেপালবাসীদিগকে ঘোর বিপদে নিপাতিত করিল। এক দিন সহসা এক গৃধ্র আসিয়া রাজার প্রাসাদ-শিখরোপরি উপবেশন করিল। শাস্ত্রমতে ভবনোপরি গৃধ্র-পতন ভীষণ অমঙ্গল-সূচক। সুতরাং সমস্ত রাজ্য সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। শান্তির জন্য দেবার্চ্চনা ও বিবিধ স্বস্ত্যয়ণের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতিকূল দৈব কিছুতেই শান্ত ইহল না। রাজপ্রণয়িণী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হই-লোক পরিত্যাগ করিলেন।

দুর্ব্বিসহ বিরহশোকে রাজা রণবাহাদুরের জ্ঞানচৈতন্য লোপ হইল। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মত্ত হইলেন। উন্মত্ত

বাতুল রণবাহাদুরের কোপাবেগ প্রথমতঃ নিরীহ গৃধ্রজাতির উপর পতিত হইল। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে কেহ গৃধ্র সংহার করিয়া আনিয়া দিবে তিনি তাহাকে পুরস্কার করিবেন। পুরস্কারের লোভে প্রতি দিন শত শত লোক গৃধ্র মারিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে রাজকোষ হইতে বৃথা অর্থব্যয় হইতে লাগিল। মন্ত্রী ভীমসিংহ কৌশল দ্বারা রাজাকে জ্ঞাত করাইলেন যে, গৃধ্রমারণ বর্ত্তমানে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কুক্কুর আর নেপালে নাই। মৃতকুক্কুরের লোভ দেখাইয়া ব্যাধেরা এতদিন গৃধ্র ধরিতেছিল। সুতরাং মহারাজ গৃধ্রমারণ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করুন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কথোপকথনের সময় স্তুতিপাঠক ভট্ট আসিয়া কারফা বাদন করিয়া স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল। ক্ষিপ্ত তাহাকে দর্শনকরিবামাত্র পরম উৎফুল্ল হইয়া ভীমসিংহকে বলিলেন, কোন চিন্তা নাই, এক্ষণ হইতে এই ভট্টদিগকে সংহার করিয়া গৃধ্র ধরিতে আজ্ঞা প্রচার কর। মন্ত্রী শুনিবামাত্র ইতি-কর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বন্দীকে লইয়া বহির্গত হইলেন। এবং ঘোষণা করিলেন, আর কেহ কারফা লইয়া রাজপথে বহির্গত না হয়।

ক্রমেই রাজার উন্মাদ প্রবল হইতে লাগিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে পাছে প্রজাগণ তাঁহার উপপত্নীগর্ব্ভজাত কুমারকে রাজাসন দান না করে, এই আশঙ্কায় তিনি সগোত্রদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। কাহারও বা চক্ষু উৎপাটন করিলেন। অনুচরবর্গের উপরেও নানা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কটাহে তৈল পাক করিয়া তপ্ত তৈল

অনুজীবীজনের ও মার্গচারী প্রজাগণের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে সহ্য করিতেপারিল সে পুরস্কার পাইল।

উন্মাদের এই প্রকার বিবিধ ভীষণ উৎপাতে, কি রাজ-পরিচারক, কি প্রজাবর্গ, সকলেই সতত কামনা করিতে লাগিল, ঈশ্বর কতদিনে এই উৎপাত হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবেন। সৌভাগ্যক্রমে অবিলম্বেই অভীষ্টদেব গোরখনাথ নেপালের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

একদিন রণবাহাদুর উপবেশন করিয়া আছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার এক জ্ঞাতি সেরবাহাদুর তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্ষিপ্ত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সকলকেই নিপাত করিয়াছি, এক্ষণে তুমিই অবশিষ্ট আছ, কিন্তু তোমাকেও অবশিষ্ট রাখিব না, কল্য নিশ্চয়ই তোমার চক্ষু উৎপাটন করাইব। রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন বটে, কিন্তু সেরবাহাদুর নৃশংস ক্ষিপ্তের পূর্ব্বকার্য্য দর্শনে তাঁহার ঐ বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিলেন, এবং দুর্ব্বৃত্ত এইবার চক্ষু উৎপাটন কর, বলিয়া এক আঘাতে হতভাগ্য রণবাহাদুরের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিলেন। সৈন্যমাত্র উপস্থিত কাজীবাল-নর্সিংকুমার স্বীয় তরবারি দ্বারা রাজঘাতক সেরবাহাদুরের মস্তক চ্ছেদন করিলেন। পাঠক ইহা জানিবেন এই কাজীবাল-নর্সিং জগদ্বিখ্যাত নেপালমন্ত্রী মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের জন্মদাতা।

এই ভীষণ ঘটনায় রাজভবনে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। মন্ত্রী ভীমসিংহ তৎক্ষণাৎ ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত

হইলেন। অবিলম্বেই এই সংবাদ প্রচার হইয়া রাজ্যমধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সর্ব্বত্র হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্তই মৌখিক। কি রাজার আত্মীয় ও অনুচরবর্গ, কি প্রজামণ্ডলী, কাহারও মধ্যে এরূপ এক ব্যক্তিও ছিল না যে অত্যাচারী ক্ষিপ্তের মরণে অন্তরে হর্ষিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় নাই।

হতভাগ্য রণবাহাদুরের এইরূপে মৃত্যু হইল। প্রথম অবস্থায় রণবাহাদুর বিবিধ সদ্‌গুণনিবন্ধন আত্মীয় স্বজনের ও প্রজাবর্গের যেমন অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া যশোভাগী হইয়াছিলেন, শেষ অবস্থায় তেমনি এক স্ত্রীর জন্য সমস্ত হারাইয়া শোচনীয় মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন এবং নেপালে চিরদিনের জন্য ঘোরতর দুর্নাম রাখিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

রণবাহাদুরের মৃত্যুর পর ভীমসিংহ নেপালের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। বালক গীর্ব্বাণ-বিক্রমকে সিংহাসনে রাখিয়া স্বয়ং অপ্রতিহত প্রভাবে সমস্ত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। ভীমসিংহ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। রণকার্য্যে তাঁহার যেমন দক্ষতা, শৌর্য্য ও পরাক্রম ছিল, রাজ্যগঠন ও শাসন বিষয়েও তাঁহার তেমনি অসাধারণ উদ্ভাবনী-শক্তি ও অশেষ ধীশক্তি ছিল। বস্তুতঃ তৎকালে এক লাহোরসিংহ রণজিৎ ভিন্ন ভারতে তাঁহার যোগ্য ব্যক্তি আর কেহই ছিল না। গুণ-প্রিয় শূর রণজিৎ স্বসমান বিবিধ গুণের পরিচয় পাইয়া স্বয়ং

প্রার্থী হইয়া ভীমসিংহের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, এবং ভীমসিংহকেই তাঁহার যোগ্য সহযোগী জ্ঞান করিতেন।

মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ যে অবস্থায় নেপালরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত নেপাল সেই অসভ্য অবস্থাতেই ছিল। ভীমসিংহ রাজ্যভার হস্তে পাইয়া এক্ষণে উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইলেন। কি সমর, কি শাসন, কি রাজস্ব, কি প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা সকল বিষয়েই তিনি সমান উদ্যোগ-সহকারে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার ন্যায় বিবিধ ক্ষমতাশালী মহাপুরুষের যত্নে সকল বিষয়েই উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া নেপালরাজ্য প্রকৃত প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। ভীমসিংহ নূতনগঠিত গোরখাজাতির পরাক্রম ও প্রভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়া প্রথমতঃ সেনা-সংঘটন পক্ষে যত্নবান হইলেন। সৈন্যশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া সৈনিক-দিগের বেতন প্রাপ্তির স্থায়ি সুবিধা করিয়াদিলেন। ঘটনা-ক্রমে সৈনিকেরা কখন অভাবে পতিত হইয়া কষ্টভোগ না করে, এই অভিপ্রায়ে পদমর্য্যাদানুসারে সৈনিক ও সৈনিক-কর্ম্মচারীদিগের ভূষণ-স্বরূপ হিরকাদি-মণ্ডিত রৌপ্য ও সুবর্ণ-পদক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাৎকালিক উৎকৃষ্ট কামান বন্দুক ও অন্যান্য যাবদীয় যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য কারখানা স্থাপন করিয়া উহার উন্নতিজন্য সতত জাগরুক রহিলেন। এইরূপে সুশিক্ষত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত গোরখালী সেনা ঐ সময়ে অন্যান্য দেশের ক্ষমতাশালী সৈন্যদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। নির্দ্দিষ্ট-সৈন্য ভিন্ন ভীমসিংহ, প্রাচীন

স্পার্টার ন্যায় নেপালকে বীরের বাসভূমি করিবার উদ্দেশে প্রত্যেক গোরখালীর সমরশিক্ষার জন্য মিলিসিয়া বা অনির্দ্দিষ্ট সেনা-প্রণালী সংস্থাপন করিলেন।

এইরূপে সৈন্যসংঘটন করিয়া অমাত্য ভীমসিং রাজস্ব ও শাসনবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। রাজ্যমধ্যে প্রদেশ ও জেলাবিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগের শাসন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল পদে সুযোগ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। সুবিচারের জন্য বিচারালয় স্থাপিত করিয়া, নবাধিকৃত রাজ্যের পর্ব্বত ও জঙ্গল ভূমি আবাদ করিবার জন্য অতি স্বল্প হারে স্থায়ি বন্দোবস্তে সর্ব্বত্র প্রজাবিলি করিলেন। তরাইয়ের জঙ্গলের কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থে স্থানে স্থানে কুঠি স্থাপন করিলেন।

এই সমস্ত বন্দোবস্তের পর রাজ্যের শোভা বৃদ্ধি ও প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি মনোযোগী হইয়া রাজ্যমধ্যে কয়েকটী সেতু ও পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এবং যাতা-য়াতের সুবিধার জন্য ঘোড়াগাড়ী প্রচলিত করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন কার্য্যকুশল অমাত্য ভীমসিংহের নেতৃত্বাধীনে অসভ্য অরণ্য-বহুল নেপালরাজ্য এইরূপে স্বল্পকালের মধ্যেই এক সভ্য পরাক্রান্ত সুন্দর রাজ্যে পরিণত হইল। গোরখাজাতির নূতন শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস এবং উদ্যোগাদিও, উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী হইতে সামান্য অকিঞ্চন গোরখা প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয়ে প্রতিফলিত

হইল। গোরখাজাতি এইরূপে উৎসাহিত ও উদ্যোগী হইয়া স্বভাবতঃ রাজ্যলোলুপ হইয়া উঠিল। তুহিনগিরির পদে পতিত সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমি। সুতরাং ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের সতৃষ্ণ নয়ন আকর্ষণ করিল। মহারাষ্ট্র-বিপ্লবে ভারতের তৎকালে যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যদি অতি-পরাক্রান্ত ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতেন, তাহাহইলে গোরখাদিগের সেই তৃষ্ণা নিবারণ হইবার অনুমাত্র ওবাধা ছিল না। কাটমুণ্ডের অধিপতি অনায়াসেই সমগ্র ভারতের অধিপতি হইতে পারিতেন, কারণ নেপালসৈন্যের ন্যায় সুশিক্ষিত রণদক্ষ সৈন্য, এবং বীর ও সুনিপুণ নেতা তৎকালে ভারতের আর কুত্রাপি লক্ষিত হইত না। বস্তুতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবলতর হইলেও একবার ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে গোরখারাও ক্রুটী করে নাই।

নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে ভীমসিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নয়ন-সিংহ পশ্চিমপ্রাপ্ত পিট্টটানা বিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। নয়নসিংহ জ্যেষ্ঠের অনুরূপ সহোদর ছিলেন। তিনি যেমন বীর, তেমনি কার্য্যকুশল, ও উদারচেতা ছিলেন।

নেপাল ও লাহোর রাজত্বের মধ্যে কোট্‌কাঁকড়া বা কুমাওন নামে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। রাজা সংসারচাঁদ তৎ-কালে এই কোট্‌কাঁকড়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। নয়নসিংহ সাধারণ দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিনা অপরাধে সংসারচাঁদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া রাজা সংসারচাঁদ অতি বিনয় সহকারে নিজ নিরপ-রাধিতা উল্লেখ করিয়া নেপাল-দরবারে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ

করিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্যের কিয়দংশ, এবং রাজা গীর্ব্বাণ-বিক্রমকে নিজ একমাত্র কুমারী সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ মন্ত্রী-সমাজ তাহাতে সম্মত না হইয়া, সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিতে লোলুপ হইলেন। বিচক্ষণ দূরদর্শী অমাত্য ভীম-সিংহেরও বুদ্ধিভ্রম হইল। তিনি ভাবিলেন না, যে গীর্ব্বাণ-বিক্রম সংসারচাঁদের একমাত্র তনয়ার পাণি প্রাপ্ত হইলে কালে সমগ্র কোটকাঁকড়া রাজ্য বিনা আয়াসে ও বিনা রক্তপাতে নেপালরাজ্যের অধীন হইবে। যাহা হউক সংসারচাঁদের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শালকাঁকড়া নামক এক ক্ষুদ্র নগরের সন্নিকটে সংসারচাঁদের সেনাপতি কীর্ত্তিসিংহের সহিত নয়ন-সিংহের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে কীর্ত্তি-সিংহের অশিক্ষিত অকর্ম্মণ্য সেনা সহজেই পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল, এবং কীর্ত্তিসিংহ সমরশায়ী হইলেন।

এইরূপে জয়লাভ হইলে পর নয়নসিংহ, দলবমপাঁড়ে নামক একজন সেনাপতির সহিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিজয়োল্লাসে অতি সমারোহের সহিত শালকাঁকড়া প্রবেশার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু অতর্কিতরূপে সহসা আক্রমণ করাতে, সমস্ত উল্লাস বিষম বিষাদে পরিণত হইল। নয়নসিংহ নগরের তোরণ-দ্বারের সন্নিকটে যেমন উপস্থিত হইলেন অমনি পার্শ্ববর্ত্তি এক দ্বিতল গৃহের গবাক্ষ হইতে সহসা বন্দুকের শব্দ হইল। শব্দ হইবামাত্র গুলি আসিয়া নয়নসিংহের কণ্ঠাস্থি ভেদ করিয়া দেহমধ্যে প্রবেশ করিল। অমনি নয়নসিংহ অচৈতন হইয়া হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। অনুচরদিগের মধ্যে বিষম কোলাহল

উপস্থিত হইল। কি হইল কি হইল বলিয়া সকলেই চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবিলম্বেই ঐ গবাক্ষ হইতে আর একবার বন্দুকের শব্দ হইল। অমনি আর এক গুলি আসিয়া দলবমপাঁড়ের দক্ষিণজঙ্ঘা ভেদ করিল। দলবম হীনসংজ্ঞ হইয়া পতিত হইলেন। কে এরূপ নৃশংস কার্য্য করিল, জানিবার জন্য কতিপয় সৈনিক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অপূর্ব্ব দৃশ্য। এক কোমলাঙ্গী বীরনারী রণমত্ত হইয়া বন্দুকহস্তে দণ্ডায়মানা। সৈনিকেরা নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র ললনা হস্তস্থিত বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিল। চারি পাঁচ জন সৈনিকও নিহত হইল। এই অদ্ভুত সংবাদ বাটীর বহির্ভাগে প্রসৃত হইবামাত্র অতীব কুতূহলী হইয়া সৈনিকেরা ভীমবেগে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিয়া রণরঙ্গিণীকে বন্দী করিল।

এ দিকে নয়নসিংহ চেতন প্রাপ্ত হইয়া ঐ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেই অপূর্ব্ব নারীকে সম্মুখে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র রমণী সমীপে উপস্থাপিত হইলেন। বন্দী হইয়াও বীরললনার হৃদয় অনুমাত্র বিচলিত হয় নাই। মুখে সেই সাহস, সেই তেজ, সেই প্রতিহিংসা বরং অধিকতর স্ফূর্ত্তিসহকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রমণী নয়নসিংহের প্রাণসংশয় দেখিয়া নিজকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া, ভ্রূভঙ্গীতে যেন আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নয়নসিংহ তাদৃশ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কিজন্য অকারণে আমায় হিংসা করিলে। রমণী নির্ভীকচিত্তে স্থির-স্বরে উত্তর করিলেন, আমি সমর-নিহত পরলোকগত কীর্ত্তিসিংহের সহধর্ম্মিণী, সুতরাং

তোমাকে হিংসা করিবার আমার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রিয়তমের হিংসাকারী তোমায় হিংসা করিয়া সম্যক প্রতিশোধ লইলাম। এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে পারিব। ঘোর দুরদৃষ্ট যে অস্ত্র-হস্তে তাঁহার ন্যায় সমরে শয়ন করিতে পারিলাম না। যাহা হউক এক্ষণে তুমি আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিয়া স্বকর্ত্তব্য প্রতি-হিংসা সমাধান কর। এই বলিয়া ললনা সোৎসুক-নয়নে মৃত্যু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রমণীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্শ্ব-শয়িত ক্ষুদ্রচেতা দলবমের প্রতি-হিংসাবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অনুরোধ করিলেন অবিলম্বে পাপীয়সীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। কিন্তু শূর নয়ন-সিংহের চিত্ত সেরূপ ছিল না। তাঁহার বীরোচিত উদার চিত্তে প্রতিহিংসা উত্তেজিত না হইয়া বরং সেই বীর-নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্ভ্রম উপস্থিত হইল। তিনি রমণীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিলেন তুমি যথার্থই পতি-পরায়ণা। আমাকে হিংসা করিয়া তুমি স্বীয় মহৎ কর্ত্তব্যই সাধন করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে কাটমুণ্ডে পাঠাইয়া দিতেছি, তথায় গিয়া সুখে বাস কর, আমার অনুরোধে রাজকোষ হইতে তোমার স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। কিন্তু পতিপরায়ণা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন যে, তোমার এই অলৌকিক আচরণ জন্য আমি তোমার শৌর্য্য-বীর্য্যের ও উদারচিত্তের যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম, কিন্তু তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে

পারিলাম না। আমি পতিবিরহে আর একমুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিব না। যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, অবিলম্বে আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিয়া আমার উপকার কর। আমি প্রাণনাথের অনুগমন করিব। তিনি আমার অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি প্রাণদণ্ড যদি না কর আমি অচিরেই আত্মহত্যা করিব। জীবনে আর আমার অণুমাত্রও প্রয়োজন নাই, আমি স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি।

এই উত্তরে রমণীর প্রতি নয়নসিংহের শ্রদ্ধাভক্তি দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। তিনি বিবিধ রূপে আশ্বাস দান করিয়া ঐ ক্রূর অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিবার জন্য রমণীকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, আত্মহত্যা করিয়া কেন অনর্থক পাতকী হইবে, বরং জীবিত থাকিলে বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পতির স্বর্গ সাধন করিতে পারিবে। অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি তুমি কাটমুণ্ডে গমন কর। তথায় অতি সমাদরে যত্নপূর্ব্বক তোমাকে রক্ষা করা হইবে। কিন্তু পতিপ্রাণা কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন নয়নসিংহ কহিলেন, যদি একান্তই প্রাণ পরিত্যাগ করা তোমার সংকল্প হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় তোমার স্বামীর অনুমৃতা হওয়াই শ্রেয়স্কর। শাস্ত্রে সহমৃতারই পতিলোক প্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। রমণী নয়নসিংহকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সাগ্রহ চিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন ইহাই আমার অন্তরের বাসনা।

তখন নয়নসিংহ কীর্ত্তিসিংহের দেহ অনুসন্ধান জন্য আদেশ করিয়া অনুজীবীদিগকে আজ্ঞা করিলেন, দানধ্যানাদি

পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য এই রমণীকে আমার নিজ কোষ হইতে প্রয়োজন মত অর্থ দান কর। আজ্ঞামাত্র সমস্ত অনুষ্ঠিত হইল। পতি-পরায়ণা, স্বামির পার্শ্বে চিতায় শয়ন করিয়া, সংসারে চিরকীর্ত্তি রাখিয়া তনুত্যাগ করিলেন। নয়নসিংহও নিজ অসাধারণ মাহাত্ম্যের পরিচয় দান করিয়া অবিলম্বেই স্বর্গারোহণ করিলেন। গুলি তাঁহার শরীরমধ্যে দূরপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। নিপুণ চিকিৎসকেরা বিশেষ যত্ন করিয়াও গুলি উদ্ধার করিতে পারিলেন না। দলবমের আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই, তিনি রক্ষা পাইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নয়নসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় জ্ঞাতি-ভ্রাতা অমরসিংহ, তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যে নয়নসিংহের ন্যূন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য ও বিবেচনা প্রভৃতি কোন গুণই তাঁহাতে ছিল না। একমাত্র দুরাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার প্রধান মনোবৃত্তি ছিল। তিনি পদপ্রাপ্ত হইয়াই আগ্রহ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শালকাঁকড়া অধিকারের পর, রাজা সংসারচাঁদের রাজধানী কোট্‌কাঁকড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুর্ব্বল সংসারচাঁদ ভয়ে পলায়ন করিয়া লাহোরসিংহ রণজিতের আশ্রয় লইলেন। রাজা রণজিৎ তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কোট্‌কাঁকড়ার সন্নিকটে শিখ ও গোরখালীসৈন্যে ছয় মাস কাল যুদ্ধ হইল। ছয়মাসের পর

গোরখালী সৈন্য পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শালকাঁকড়ায় আসিয়া অবস্থিতি করিল। রণজিতের সৈন্য, অনুসরণ করিয়া শালকাঁকড়া অবরোধ করিল। এ স্থানেও উভয়পক্ষে ছয় মাস কাল যুদ্ধ চলিল। কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না। শালকাঁকড়ার দুর্গ সহসা অধিকার করা সিখসৈন্যের দুষ্কর হইল। গোরখালী সৈন্যও বহির্গত হইয়া সিখসৈন্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। সুতরাং জয়-লক্ষ্মী মধ্যভাগে দোলায়িত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ছয়মাস অতীত হইলে পর রাজা রণজিতের মধ্যবর্ত্তিতায় উভয়পক্ষে সন্ধিস্থাপন হইল। সংসারচাঁদ শালকাঁকড়া পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যভাগ নেপাল-রাজকে প্রদান করিলেন।

এইরূপে সমর শেষ ও সন্ধিস্থাপন হইয়া নেপালের পশ্চিম সীমা শালকাঁকড়া পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ ক্রোশ বর্দ্ধিত হইল। অমরসিংহ বিজয়ী হইয়া আরও দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এই সময় ভারতের সাম্রাজ্য লইয়া ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রী-য়ের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে ছিল। ইংরাজ অধিকতর যুদ্ধ-দক্ষ হইলেও, রণপ্রমোদী মহারাষ্ট্রীয়ের নিয়ত কূট অভ্যু-থান ও আক্রমণে, ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় নবপ্রবুদ্ধ, রণলিপ্সু, দুরাকাঙ্ক্ষ গোরখাজাতির সতৃষ্ণ দৃষ্টি যে সুবর্ণ-ভূমি ভারত ভূমিতে পতিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি। বাস্তবিক ইংরাজের ন্যায় প্রবল শত্রু প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে

হয়ত গোরখার বিজয় পতাকা কুমারিকার সাগরবেলায় উড্ডীন হইত।

নেপালরাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষেরা সীমা লইয়া সহসা ইংরাজের সহিত কলহ উপস্থিত করিলেন। তৎকালে ইংরাজদিগের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিগ্রহ শেষপ্রায় হইয়াছিল। নূতন শত্রুতা অকর্ত্তব্য ভাবিয়া, ইংরাজ প্রবল হইলেও, নেপালদূতের মতে মত দিয়া কথঞ্চিৎ বিবাদ শান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ইংরাজ নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু, গোরখার দুরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল না। বরং ইংরাজের প্রশ্রয়ে অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সুতরাং গোরখা আততায়ী হইলেন। সন্ধি-সত্ত্বেও অমরসিংহ সহসা প্রান্তস্থাপিত ইংরাজ দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গস্থিত প্রহরীদিগকে হত ও দূরীকৃত করিলেন। অগত্যা ইংরাজকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

ইংরাজ-সেনাপতি জেনারেল অক্টর্‌লনি ৩০,০০০ সৈন্য লইয়া নেপালে যাত্রা করিলেন। পশ্চিম-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া অক্টর্‌লনি স্বয়ং অমরসিংহকে আক্রমণ করিলেন, এবং একদল সৈন্য সঙ্গে দিয়া জেনারেল জিলেসপিকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন। জিলেসপি ডেরাডুন্‌ বা বটৌল হইয়া নেপালে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি এক-জন বিশেষ সামরিক-পুরুষ ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে শূর নয়নসিংহের পুত্র বীর, উজীর-সিংহের সহিত সমরে সাক্ষাৎকার করিতে হইয়াছিল। জিলেসপি অদ্ভুত সাহস ও কৌশল প্রকাশ করিয়া উজীর-সিংহ রক্ষিত দুর্গ আত্মসাৎ করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই

কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে বিপক্ষের গুলির দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া রণভূমিতে চিরশয়ন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্য প্রায় সমুদায়ই নিহত হইল। উজীর-সিংহ বিজয়ী হইয়া হতাবশিষ্ট ইংরাজদিগকে বন্দী করিয়া কাটমুণ্ডে প্রেরণ এবং বটৌল পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন।

এই ভীষণ সংবাদে কলিকাতার অধ্যক্ষগণ মহা ভীত হইয়া উঠিলেন। পরাজিত দেশীয় রাজগণ অবসর প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা সকলেই হৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। সিন্ধিয়া এবং কতিপয় রাজা যুদ্ধের উদ্যোগও করিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস হেষ্টিংস্ দৃঢ়তর উদ্যোগ ও অধ্যাবসায় সহকারে সত্বর সমরানল প্রজ্বলিত করাই সুনীতি স্থির করিলেন। তদনুসারে অধিকতর সেনা ও যুদ্ধসামগ্রী অক্টর্‌লনির নিকট প্রেরিত হইল। জেনারেল অক্টর্‌লনি নবাগত সৈনিক সহায় প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত আগ্রহসহকারে অমরসিংহকে আক্রমণ করিলেন। অমরসিংহ চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়া অদ্ভুত শৌর্য্য সহকারে শত্রু নিবারণ করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বরং পরাজিত হইয়া সরযূতীরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হই-লেন। জেনারেল অক্টর্‌লনি বিজয়ী হইয়া পলায়নশীল অমরসিংহকে অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন।

এই সংবাদে নেপালের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভীত হইয়া সন্ধির

জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কতিপয় সর্দ্দার এবং স্বয়ং অমরসিংহ সন্ধি-প্রস্তাবের দৃঢ়তর প্রতিবাদ করিলেন। অমর-সিংহ চীনের সাহায্যপ্রার্থনা জন্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ কিছুতেই সম্মত না হইয়া সন্ধির জন্য ইংরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সীমান্তে উভয়পক্ষের সমাগম হইল। ইংরাজ বিজয়ী, সুতরাং প্রভাবে অসঙ্গত প্রার্থনা করিলেন। নেপাল সম্প্রতি পশ্চিম-প্রান্তে যতদূর জয় করিয়াছিলেন, সেই সমগ্রপ্রদেশ এবং তরাই প্রার্থনা করি-লেন। তরাই প্রার্থনা করাতেই সন্ধির ব্যাঘাত জন্মিল। কারণ নেপালের প্রায় সকল আমীরেরই তরায়ে কিছু না কিছু সম্পত্তি ছিল; সুতরাং সকলেই প্রতিবাদী হইলেন। অতএব কর্ত্তৃপক্ষগণ ইংরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। সুতরাং সন্ধি না হইয়া, পুনর্ব্বার সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। এবার অক্টর্‌লনি চিরিয়াঘাঁটী হইয়া শত্রু আক্রমণ করি-লেন। ভীমসিংহের ভ্রাতা রণবীরসিংহ এই পথের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। উভয়পক্ষে কিছুকাল ঘোরতর সংগ্রাম হইল, কিন্তু কেহই বিজয়ী হইল না। অবশেষে উভয়পক্ষই শ্রান্ত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন। সন্ধিতে নির্দ্দিষ্ট হইল, ইংরাজ পশ্চিমে সরযূ পর্য্যন্ত যতদূর আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজের হইবে। আর গোরখা, দক্ষিণে বটৌল পর্য্যন্ত যে প্রদেশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গোরখারই থাকিবে। উভয়পক্ষের পলায়িত অপরাধী, উভয় রাজ্যের সীমান্ত হইতে, ছয় ক্রোশের মধ্যে ধৃত হইলে পরস্পরে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ছয় ক্রোশের অধিক হইলে

আর কোন পক্ষ পলায়িত অপরাধী প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। এবং ইংরাজ ও নেপালির রেসিডেণ্ট্ পরস্পরের রাজ্যে থাকিবেক। এইরূপে ইংরাজ ও গোরখার সমর শেষ হইল। মন্ত্রী ভীমসিংহেরও এই শেষ কার্য্য।

অনতিবিলম্বেই রাজার মৃত্যু হইল। কুমার রাজেন্দ্রবিক্রম সিংহাসন অধিকার করিলেন। রাজেন্দ্র বিক্রমসাহা ক্ষীণমস্তিষ্ক ও স্ত্রৈণ ছিলেন ; সুতরাং তিনি নামমাত্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার দুই রাণীতেই যথেচ্ছা শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভীমসিংহ মন্ত্রী থাকিতে, তাঁহারা স্বীয় অভীষ্ট সম্যক্ সাধন করিতে পারিতেন না।

সুতরাং প্রথমতঃ তাঁহারা ভীমসিংহের অধঃপাতে চেষ্টিত হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে জ্যেষ্ঠারাজ্ঞীর কণিষ্ঠ কুমার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই সুযোগে জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী ঘোষণা করিলেন, ভীমসিংহ বিষ-প্রয়োগ করিয়া তাঁহার পুত্রের প্রাণনাশ করিয়াছেন। ভীমসিংহ নেপালের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। অভীষ্টসাধন করিবার জন্য ভীমসিংহের এরূপ নৃশংসকার্য্যে লিপ্ত হইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আর ঘটনা সত্য হইলেও, তাঁহাকে কোন কথা বলে, নেপালে এরূপ এক ব্যক্তিও ছিলেন না। কিন্তু ভীমসিংহ অভিমানী, বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, মতিভ্রম-বশতঃ আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

এতাদৃশ শোচনীয় রূপে মহাত্মা ভীমসিংহের জীবন শেষ হইল। ভীমসিংহ সর্ব্বপ্রকারেই মহাত্মা ছিলেন। ফলতঃ রাজা পৃথ্বীনারায়ণ ব্যতীত, নেপালে ভীমসিংহের সদৃশ দ্বিতীয়

ব্যক্তি অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজা পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল উর্জ্জাপন মাত্র করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা ভীমসিংহ নেপালরাজ্য গঠন ও উহার সর্ব্বাঙ্গীন শোভা সম্পাদন করেন। নেপালের যাহা কিছু উন্নতি সকলই সেই মহামন্ত্রীর অসাধারণ ধীশক্তি-জনিত। তিনি যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন, নেপালে অদ্যাবধি তাহাই প্রচলিত ও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কেহই তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হন নাই।

সংসারের রীতিই এই, পদস্থ ব্যক্তি সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাধু এবং রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজারঞ্জক হইলেও, তাঁহার পদচ্যুতি বা মৃত্যুতে, এ যাবৎ দিবাভীতের ন্যায় লুক্কায়িত নীচ-প্রকৃতি ক্ষুদ্র শত্রুগণ সাহসী হইয়া জঘন্য শত্রুতাচরণ করিতে থাকে। স্বর্গারোহণের পর ভীম-সিংহেরও সেই দশা ঘটিল। নীচাশয় শত্রুগণ তদীয় বংশীয়-দিগের অনিষ্টাচরণে সচেষ্ট হইল। ভীমসিংহের পুত্র বা কন্যা কিছুই ছিল না। স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর নয়নসিংহের পুত্র ও কন্যাকে দত্তক ও পুত্রিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রহণ-পুত্রের নাম মাৎবরসিংহ। পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত-রাজার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধগ্রহিতা কাজিবালনর্সিং ভীমসিংহের দত্তক-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে বিখ্যাত জঙ্গবাহাদুর জন্ম-গ্রহণ করেন।

ইংরাজসমরের প্রবর্ত্তক অমরসিংহ এবং জিলিসপিজেতা নয়নসিংহ-তনয় উজীরসিংহ, ইতিপূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং ভীমসিংহের মৃত্যুকালে তদীয় বংশে তদীয়

পুত্র জেনারেল মাৎবরসিংহ, ও চিরিয়াঘাঁটীর সমর-নায়ক তদীয় ভ্রাতা রণবীরসিংহ, এই দুই জন মাত্র পুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। মাৎবরসিংহ তরুণবয়য়স্ক, এবং রণবীর, সাহসী ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। শত্রুর, বিশেষ জ্যেষ্ঠারাজ্ঞীর অত্যাচারভয়ে ভীত হইয়া, মাৎবর লাহোরে রণজিতের পুত্র নয়নেহল-সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নয়নেহল যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বার্ষিক পঞ্চসহস্র মুদ্রা বেতনে সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত করিলেন। রণবীর, বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া কাশীধামে যাইয়া মহৎ তত্ত্ব সাধনে নিযুক্ত হইলেন।

মহাত্মা ভীম-সিংহের মৃত্যুতে নেপাল-রাজ্য ক্ষণ-কাল অবসন্ন-প্রায় হইল। রাজা রাজেন্দ্র-বিক্রম বাতুল, তাহাতে স্ত্রৈণ, সিংহাসনে অধিরূঢ় মাত্র ছিলেন। রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না, দেখিবারও ক্ষমতা ছিল না। ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। রাজপুরুষগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। এই বিষম সময়ে ভূত-পূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী দামোদরপাঁড়ের পুত্র রণজংপাঁড়ে প্রধান মন্ত্রীপদে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু পিতার ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। বিশেষতঃ অতি বিষম সময়ে অতি গুরুভার গ্রহণ করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে অনতিবিলম্বেই অবসন্ন হইতে হইল। বিবিধ চেষ্টা করিয়াও শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তবৎ হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে অপসারণ করিয়া ফতেজংসাহা নামক জনৈক অযোগ্য ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীত্বপদে

অভিষিক্ত হইলেন। ফতেজং অসার ব্যক্তি ছিলেন। অসার বলিয়া তাঁহার নিজেরও জ্ঞান ছিল। গুরুভার বহন করিতে কোন রূপেই সমর্থ হইবেন না দেখিয়া, তিনি নিজেই পদ-ত্যাগ করিলেন। রঙ্গলাল উপাধ্যায় নামক আর একব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। রঙ্গলাল যথাকথঞ্চিৎ দুইবৎসরকাল অধিনায়কতা করিলেন। ইহাঁর শাসনকালে জ্যেষ্ঠারাজ্ঞী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কনিষ্ঠামহিষী রাজ্যে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। কয়েক বৎসর অরাজকতা, এবং রঙ্গলালকে মন্ত্রীপদের নিতান্ত অনুপযুক্ত দেখিয়া, আমীরগণ একত্রিত হইয়া, লাহোর হইতে মাৎবরসিংহকে আনায়ন করিয়া মন্ত্রীত্বপদে নিযুক্ত করিবার জন্য রাজ্ঞীকে পরামর্শ দান ও উপরোধ করিলেন। বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী তাহাদিগের প্রস্তাবে স্বীকৃতা হইলেন। তদনুসারে মাৎবরের নিকট পত্র প্রেরিত হইল। পিতৃশত্রু জ্যেষ্ঠারাজ্ঞী পরলোকপ্রস্থিতা হইয়াছেন এবং কনিষ্ঠারাজ্ঞী স্বয়ং পত্র লিখিয়াছেন, দেখিয়া মাৎবরসিংহ হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সর্ব্ব-লোকের সমাদরের সহিত নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন। প্রজাগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইল, এবং অবিলম্বেই রাজ্যমধ্যে শান্তি ও সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইল। মাৎবর কোন অংশেই মহাত্মা পিতার অনুপযুক্ত ছিলেন না। তিনি যেমন বীর ও সাহসিক, তেমনি সুবিচারক ছিলেন। তদীয় সুবিচারে অর্থী-প্রত্যর্থী, উভয়েই সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সদালাপ, দেবদ্বিজভক্তি, বদান্যতা, অতিথিসেবা প্রভৃতি অসামান্য সদ্‌গুণেও মাৎবর বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। নিয়ত

দানধ্যানদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। বিদেশস্থব্যক্তি তীর্থ দর্শনাদি সূত্রে নেপালে আগমন করিলে, যাহাতে সমাদরসহকারে সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে তাহার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই সমস্ত উদার-গুণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রজাগণ মাৎবরকে কলাবাহাদুর উপাধি দান করিলেন।

রাজ্যে সুশাসন স্থাপিত হইল। মাৎবরের সুবিচারে ও যোগ্যতায় প্রজাগণ সকলেই সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজ্ঞী, মাৎবরের বিনাশ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ, সুরেন্দ্রবিক্রম ও উপেন্দ্রবিক্রম নামে জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর দুই কুমার ছিল। রাজ্ঞী মাৎবরসিংহকে অনুরোধ করিলেন, তিনি গোপনে ঐ দুই কুমারকে হত্যা করিয়া নিজ পুত্রের সিংহাসনারোহণের পথ পরিস্কার করিয়া দেন। মাৎবর ক্ষুদ্রচেতা নরপিশাচ ছিলেন না। সুতরাং রাজ্ঞীর নৃশংস প্রস্তাবে কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। প্রত্যুত তাদৃশ দুশ্চিন্তার জন্য রাজ্ঞীকে যথেষ্ট তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিলেন। সুতরাং নিরাশাক্রোশা, স্বার্থ-পরায়ণা দুষ্টাত্মা রাজ্ঞী, ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় অন্ধ হইয়া মাৎবরের জীবন-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কি উচ্চ, কি নীচ, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল প্রজাই মাৎবরের গুণে মুগ্ধ এবং বশীভূত থাকাতে প্রকাশ্যে মাৎবরের অঙ্গুলীমাত্রে বেদনা দানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং গুপ্তহত্যার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বুদ্ধি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের অধ্যবসায় অবিশ্রান্ত ও

অপ্রতিহার্য্য। জগতে তাহাদিগের অকর্ত্তব্যও কিছুই নাই। প্রতিহিংসাপরতন্ত্রা মহিষী, উপযুক্তসাধন বিবেচনায়, গগণ-সিংহ নামক জনৈক রাজপারিষদকে গোপনে আলিঙ্গন দান করিয়া তাঁহার নিকট নিজ অভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন। এবং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীপদে অভিষেক করিবেন অঙ্গীকার করিয়া, অভীষ্ট-সাধন জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করিলেন। সদৃশনৃশংস গগণসিং, প্রেমে মুগ্ধ এবং দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া মাৎবরসিংহের প্রাণনাশে স্বীকৃত হইলেন।

মাৎবরের ভাগিনেয় জঙ্গবাহাদুর, গগণসিংহের বিশ্বস্ত ও অনুগত অনুচর ছিলেন। গগণ ইহাঁকেই ঐ নৃশংস কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। জঙ্গ মাতুলের অন্নে প্রতিপালিত, এবং মাতামহের স্নেহে ও অনুগ্রহে পদস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আগ্রহ-সহকারে ঘোরতর কৃতঘ্নতায় প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন রাত্রিযোগে রাজ্ঞী পীড়িত হইয়াছেন বলিয়া, মাৎবর রাজপ্রাসাদে আহুত হইলেন। উদারচেতা মাৎবর, দুরভিসন্ধির বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। আহ্বানমাত্রে নিশঃঙ্কচিত্তে প্রাসাদে একাকী উপস্থিত হইলেন। কৃতঘ্ন জঙ্গ তাঁহার জীবন বিনাশ করিয়া সিংহাসনপথ রক্তে পরিস্কার করিবার জঘন্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন।

নেপালগঠয়িতা মহাত্মা ভীমসিংহের সুযোগ্য বংশধর এইরূপে কৃতঘ্ন আত্মীয়ের হস্তে বিনাপরাধে জীবন সমর্পণ করিলেন। প্রজামণ্ডলী সকলেই অপার বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। তাঁহার গুণগ্রাম মনে করিয়া, আপামর

সাধারণ সকলেই তজ্জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। বস্তুত মাৎবর যেমন সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা, তেমনি বিবিধ সামাজিক-গুণে বিভূষিত ও সদালাপী ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। অবকাশ সময়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইয়া বিশুদ্ধ গান বাদ্যে আমোদ করিতেন। বীর গোরখাজাতি অনিবার্য্য-শৌর্য্য-বীর্য্যনিবন্ধন তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য সাহসের এক গল্প আছে।

একদিন সহসা পার্শ্ববর্ত্তী কানন হইতে বহির্গত হইয়া এক ভীষণ ব্যাঘ্র নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহার সংহারণে উদ্যোগী হইল। কিন্তু মাৎবর উহাকে সজীব ধারণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। আজ্ঞা মাত্র চতুর্বিংশতি-সহস্র সৈন্য ব্যাঘ্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। কিন্তু নিরস্ত্র হইয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইতে কেহই সাহসী হইল না। মাৎবর অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া দর্শন করিতে ছিলেন। যখন দেখিলেন যে কেহই ব্যাঘ্রের নিকট অগ্রসর হইল না, তখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিয়া অকুতোভয়ে দৃঢ় পদসঞ্চারে নিজেই সমীপবর্ত্তি হইয়া ব্যাঘ্রের গ্রীবা ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে পতিত ও দক্ষিণ জানুদ্বারা তাহার গ্রীবা নিষ্পেষণ করিলেন। ব্যাঘ্রও নিজ পরাক্রম প্রকাশের উদ্যোগ করিল, কিন্তু নিমেষ মধ্যে চারিদিক হইতে সৈন্যগণ ধাবিত হইয়া উহার প্রাণনাশ করিল।

কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই অনুরোধ রক্ষা করে না। এতাদৃশ বিবিধ অসামান্য সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া মাৎবর অকালে বিনা-পরাধে লোলজিহ্বা রাক্ষসী দুরাকাঙ্ক্ষার উদরসাৎ হইলেন।

মাৎবর নেপালের কোন বিশেষ নূতন অনুষ্ঠান করেন নাই; কেবল চারি হাজার সৈনিক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

মাৎবর নিহত হইলে কণ্টক দূর হইল। সিদ্ধকামা রাজ্ঞী প্রণয়ী গগণকে প্রধান মন্ত্রীপদে অভিষেক করিলেন। জংবাহাদুর, ফতেজং ও অভিমান রাণা এই তিনজন গগণের অনুচর জেনারেল হইলেন। এই চারিজন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

দুরাকাঙ্ক্ষী মহিষী প্রতিবন্ধক মাৎবরসিংহকে অপসরণ করিয়া এক্ষণে স্বীয় প্রধান অভীষ্ট-সাধনে তৎপর হইলেন। কুমার সুরেন্দ্র-বিক্রম ও উপেন্দ্র-বিক্রমকে হত্যা করিবার জন্য গগণকে উত্তেজনা করিলেন। বিমূঢ় গগণ অবিচারিত চিত্তে প্রণয়িণীর কার্য্যসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই অভিসন্ধি সুচতুর উপেন্দ্রের কর্ণ-গোচর হইল। উপেন্দ্র ও গগণসিংহের প্রাণনাশের জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পদারোহণের একাদশ মাস পূর্ণ হইলে একদিন গগণসিংহ ত্রিতল প্রসাদোপরি পূজায় উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় সহসা এক বন্দুকের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গেই দুইটা গুলী আসিয়া গগণের মধ্যস্থান বিদ্ধ করিল। অমনি গতাসু হইয়া প্রাসাদোপরি পতিত হইলেন। কে, কোথা হইতে গুলী মারিল, বিশেষ অনুসন্ধানেও তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না। কিন্তু সকলেই অনুমান করিল, কুমার উপেন্দ্র বিক্রমই এই কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন।

যাহাই হউক গগণের এই আকস্মিক মৃত্যুতে নিরীহ

নিরপরাধ কুমার সুরেন্দ্র ও উপেন্দ্র রক্ষিত, এবং মাৎবর সম্যক প্রতিহিংসিত হইলেন।

গগণসিংহের মৃত্যুর পর কণিষ্ঠারাজ্ঞী জেনারেল জঙ্গ্‌কে নিজ দুরাককাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির প্রধান সাধনস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। জঙ্গের উচ্চাভিলাষ এবং বুদ্ধিমত্তা, উদ্যোগ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ উপলব্ধি করিয়া চতুরা রাজ্ঞী এরূপ বিশ্বাসও করিয়াছিলেন যে, জঙ্গের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেই দুরভিসন্ধির বিপরীত ফল ফলিল।

বিশ্বস্ত কার্য্য-সচিব ও প্রণয়সহচর গগণসিংহের হত্যায় অধীর হইয়া রাজ্ঞী ব্যাঘ্রীর ন্যায় প্রতিহিংসার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি জঙ্গকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, যে কোন উপায়ে হউক রাজ্যের সমুদায় সম্ভ্রান্ত আমীর-দিগকে হত্যা করিতে হইবে। উচ্চপদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় জঙ্গ তাহাতেও অবিচারিত চিত্তে স্বীকৃত হইয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক ঐ রজনীতেই আমীরদিগকে শিস্‌মহল নামক সভাগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিঃশঙ্ক ও নিরীহ আমীরগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সকলেই সভাস্থলে অরক্ষিত ভাবে সমবেত হইলেন। এদিকে জঙ্গের অধীনস্থ চারি পল্টন সেনা পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে শিস্‌মহলের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। সভাস্থলে জঙ্গের পক্ষীয় সার্দ্ধশত সজ্জিত পুরুষ শোণিত-লিপ্সায় ব্যগ্র হইয়া অবসরের অপেক্ষা করিতেছিল। অবি-লম্বেই বাদানুবাদ ক্রমে বিবাদ উত্থাপন হইল। অভিমানী অমর্ষণ আমীরগণ সকলেই উচ্চ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু উপায়-

হীন। তাঁহারা নিরস্ত্র, জঙ্গের পক্ষ শসস্ত্র। পলায়নেও ব্যাঘাত; শিস্‌মহল সেনায় বেষ্ঠিত; অগত্যা সকলকেই মস্তক প্রদান করিতে হইল। ঐ কালরজনীতে জঙ্গবাহাদুর, ফতেজংসাহা, অভিমান রাণা প্রভৃতি পঞ্চ চত্বারিংশৎ আমীরের শিরশ্ছেদন করিয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিস্কার করিলেন। নেপালে তাঁহার সমকক্ষ বীর, বা রাজনীতিজ্ঞ আর কেহই রহিল না।

পরদিন প্রাতে রাজ্ঞী জঙ্গকে সমাদর করিয়া প্রধান মন্ত্রীত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া আপাতত জঙ্গের আকাঙ্ক্ষা অনেকদূর চরিতার্থ হইল। এখন সেই পদ যাহাতে অবিচলিত থাকে এবং উত্তরোত্তর যাহাতে তিনিই নেপালের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারেন, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যে উপায়ে তিনি উন্নতপদে আরোহণ করিয়াছেন, সেই পদে অবস্থিতি করিতে হইলে, আর সে উপায় অবলম্বন করিলে চলিবে না। রাজ্ঞী এক্ষণে হীনবল হইয়াছেন। প্রজাবৃন্দ তাঁহার প্রতি ঘোরতর বিরক্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহার পতন নিকটবর্ত্তী। সুতরাং পতনোম্মুখ আশ্রয়ের অবলম্বন পরিত্যাগ করা বিধেয় বিবেচনা করিয়া তিনি অন্যপথ অবলম্বনে চেষ্টিত হইলেন।

চারিমাস অতিবাহিত হইল। এক দিবস রাজ্ঞী বিশ্বস্তচিত্তে জঙ্গকে আদেশ করিলেন যে সপত্নীজাত কুমারদ্বয় সুরেন্দ্র-বিক্রম ও উপেন্দ্র-বিক্রমকে হত্যা করিয়া স্বীয় গর্ভজাত পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু

তিনি এই নিষ্ঠুর আদেশ পালনে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজ্ঞীর স্বভাব বিশেষ জানিতেন। এক্ষণে সমগ্র আমীরই স্বপক্ষীয় জানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। জঙ্গবাহাদুরের এইরূপ অভাবনীয় আচরণে রাজ্ঞী বিস্মিত ও হতাশ হইলেন। কিন্তু সহসা কোন বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া গোপনে তাঁহার প্রাণ-বধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক বিবেচনার পর গগণসিংহের বিশ্বস্ত পারিষদ বীরধ্বজবসানৎকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। স্থিরীকৃত হইল, জঙ্গকে প্রাসাদে একাকী আহ্বান করিয়া হত্যা করা হইবে। কিন্তু জঙ্গের সুসময় সমাগত। লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি নিয়ত সুপ্রসন্না। সুতরাং কাহার সাধ্য তাঁহার অনিষ্ট সাধন করে। কণিষ্ঠা রাজ্ঞীর ষড়যন্ত্র,কুমার সুরেন্দ্র-বিক্রমের প্রধানা মহিষী, দাসী-পরম্পরায় অবগত হইলেন। তিনি দুর্ব্বৃত্তার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ জঙ্গবাহাদুরকে সংবাদ পাঠাইলেন। জঙ্গবাহাদুর সতর্কভাবে প্রতিবিধানের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাদৃশ উদ্যোগী, প্রত্যুৎ-পন্নমতি, ধীমান্ পুরুষের পক্ষে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা বিচিত্র নহে। তিনি উপস্থিত ঘটনার আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপায় স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন। যেমন ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইলেন, অমনি জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর পুত্র সুরেন্দ্র-বিক্রমের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সুযোগ্য সুপরা-ক্রান্ত প্রধান মন্ত্রির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিরাশ্রয় বালক সুরেন্দ্র ও উপেন্দ্র মহা আনন্দে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তি হইলেন।

ওদিকে পরামর্শ স্থির করিয়া কাজী বীরধ্বজ কোন গুরুতর কার্য্য উপলক্ষে জঙ্গকে একাকী প্রাসাদে আগমন করিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিয়া, অপর একাদশ ব্যক্তির সহিত সশস্ত্রে প্রাসাদদ্বারে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। এদিকে জঙ্গ দূতমুখে সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র কনিষ্ঠকুমার উপেন্দ্রের সমভিব্যাহারে ন্যূনাধিক একশত সশস্ত্র অনুচরের সহিত ভাণ্ডারখালে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই উভয়ে সহসা কাজী বীরধ্বজের সহিত রাজ্ঞীপক্ষ দ্বাদশ-জনকে তরবারিমুখে অর্পণ করিলেন। পরে ক্ষণমাত্র অপব্যয় না করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্ঞীকে বন্দী করিলেন। সমস্ত কার্য্য এত সত্বর সাধিত হইল যে, রাজ্ঞী আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে অবসর পাইলেন না।

রাজ্ঞীকে বন্দী করিয়া উপেন্দ্রবিক্রম রাজ্যের সমস্ত সেনাবর্গকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র সমস্ত সৈন্য-সমবেত হইল। তখন উপেন্দ্র, সৈন্যবর্গ ও আমীরসমূহের সমক্ষে গগণসিংহের সহিত রাজ্ঞীর ব্যভিচার ও অত্যাচারের বিষয় উল্লেখ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকলের মত প্রার্থনা করিলেন। জঙ্গের সাহায্যে রাজ্ঞীর ব্যভিচার সপ্রমাণ হইল। অগত্যা রাজ্ঞী নিজমুখেও দোষ স্বীকার করিলেন। তখন তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হইল। তিনি স্বীয় গর্ভজাত কুমারদ্বয় সমভিব্যাহারে বারাণসীধামে যাত্রা করিলেন। রাজকুমারদ্বয়ের ভরণপোষণ জন্য রাজ্ঞীর নিজ সম্পত্তি হইতে ৫২ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা তাঁহার সহিত প্রেরিত হইল।

প্রেয়সী নির্ব্বাসিত হইলে পর স্ত্রীজিত, নিরাশ্রয় রাজেন্দ্রবিক্রম শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি কোনমতে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া অবশেষে তীর্থযাত্রার ভান করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় প্রণয়িণীর সঙ্গসুখ পূর্ণলাভ করিয়া নির্ব্বৃতচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে চারিমাস অতিবাহিত করিয়া প্রেয়সীর উত্তেজনায় নেপালের সীমাবর্ত্তি আলৌনামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় পূর্ব্বনিহত আমীরদিগের আত্মীয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া জঙ্গের প্রাণবধের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

সতত জাগরূক সুচতুর জঙ্গ, ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, সুরেন্দ্রের মত করাইয়া, চারিসহস্র সৈন্য সমভিব্যারে রাজকুমার উপেন্দ্রবিক্রম ও নিজ ভ্রাতা রণদীপসিংহকে রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। রণদীপ সিংহ রাজপুত্রের সাহায্য লইয়া রাজাকে অনায়াসে বন্দী করিয়া রাজধানীতে আনায়ন করিলেন। জঙ্গ বন্দীকৃত রাজাকে চিরকালের জন্য ভক্তগ্রাম নগরে নজরবন্দী করিয়া, কুমার সুরেন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

এতদিনের পর জঙ্গের দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ ও মনস্কামনা পূর্ণ হইল। স্বরূপতঃ রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত হইলেও এতদ্দিন তিনি প্রভূতা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। এক্ষণে রাজা রাজেন্দ্রবিক্রমকে বন্দী করিয়. তিনি স্পষ্ট সর্ব্বে-সর্ব্বা হইলেন। বাতুল সুরেন্দ্রকে ক্রীড়াপুত্তলিকা করিয়া স্বয়ং

তিনি জাতিতে কুঁওার ছিলেন, এক্ষণে রাণাজি উপাধি (সর্ব্বোচ্চ ক্ষত্রিয়-উপাধি) গ্রহণ করিয়া জনসমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত রহিলেন না। ক্ষত্রিয়-প্রধান কূটুক রাজার পুত্রীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। কাশীপুরের রাজা শিবরাজ-সিংহের কন্যার সহিত নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎ-জঙ্গের বিবাহ দিলেন। এবং রাজা সুরেন্দ্র-বিক্রমের কুমার ত্রৈলোক্যবিক্রমকে নিজের তিন কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সুতরাং সমস্ত ভারতে ক্ষত্রিয়বংশজ বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এইরূপে কর্ত্তব্য শেষ করিয়া স্বীয় প্রাণদাতা অনুজ ব্যোম-বাহাদুরকে প্রাইম-মিনিষ্টর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এবং স্বয়ং মহারাজ উপাধি লইয়া সর্ব্ব কর্ত্তব্য-লিপ্ত অথচ সর্ব্বদা নির্লিপ্তভাবে রাজসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সংবৎ ১৯০৯ অব্দে জঙ্গবাহাদুর মিত্রতাসূত্রে সাক্ষাৎ করিবার জন্য, উপহারাদি লইয়া চীন যাত্রা করিলেন। চীনসম্রাট তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদরের সহিত গ্রহণ এবং তাঁহার আমূল পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে যং লিং পিম্ মা কো কাংওয়াং সিয়াং (অর্থাৎ স্বনামা পুরুষ) উপাধি দান করিলেন। জঙ্গ এইরূপ সম্মানিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

চীনযাত্রার একবৎসর পরে প্রয়াগের দুর্গে জয়বাহাদুরের মৃত্যু হইল। জয়ের মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া জঙ্গ, বদরীনরসিংহ ও কুমার উপেন্দ্রবিক্রমকে স্বদেশে প্রত্যানয়ন ও ক্ষমা করিয়া

বদরীনরসিংহকে তান্‌সিনের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত এবং উপেন্দ্রবিক্রমকে বার্ষিক ১২৫০০০ মুদ্রা বৃত্তি দান করিয়া রাজোচিত সম্মানে রাখিতে প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তেজীয়ান উপেন্দ্র, তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেবার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্যাপি সেইভাবেই নেপালে অবস্থিতি করিতেছেন।

জঙ্গের শাসনের নবম বৎসরে (সংবৎ ১৯১২) নেপালকে এক সামান্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তিব্বৎসীমায় নেপালের যে রেসিডেণ্ট ছিল, তিব্বতীরা কোন কারণে তাঁহার কুঠী লুণ্ঠন ও তাঁহাকে বন্দী করিল। এই সম্বাদ পাইয়া মহারাজ জঙ্গবাহাদুর, প্রাইম্‌মিনিষ্টর বোমবাহাদুর ও জেনারেল জগৎসমসের-জঙ্গকে চারি হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যোমবাহাদুর কুতিসহর ও জগৎসমসের কেরুংসহর অধিকার করিলেন। কিন্তু এই ঘটনার কিয়দ্দিবসানন্তর এক দিন রজনীতে তিব্বতীরা কৌশলক্রমে ব্যোমবাহাদুরের অধীনস্থ সমস্ত গোরখা-সৈন্যকে নিহত করিয়া কুতিসহর পুনরধিকার করে। ব্যোমবাহাদুর পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

জঙ্গবাহাদুর ব্যোমবাহাদুরের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে জেনারেল ধীরসমসের জঙ্গকে পঞ্চসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তিব্বতে প্রেরণ করিলেন। ধীরসমসের অল্পায়াসে কুতিসহর পুনর্গ্রহণ করিলেন। তিব্বতীরা অবিলম্বেই পরাজিত হইয়া সন্ধিসংস্থাপনের প্রস্তাব করিল।

ধীরসমসের তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তিব্বতীরা বন্দীকৃত রেসিডেণ্টকে প্রত্যর্পণ করিল, ও তিব্বতে নেপালী-রেসিডেণ্টের সমস্ত ব্যয় স্বীয় রাজকোষ হইতে প্রদান করিতে সম্মত হইল। আরও স্থির হইল, যে নেপালী-ব্যবসায়ীদিগের সমস্ত মোকদ্দমা নেপালী-রেসিডেণ্ট বিচার করিবেন। এই বৎসরে প্রাইম্‌মিনিষ্টার বোমবাহাদুরের মৃত্যু হইল। জঙ্গবাহাদুর পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ভ্রাতা কৃষ্ণবাহাদুরকে কম্যাণ্ডারইন্‌চিফ্ করিয়া স্বয়ং প্রাইম্‌মিনিষ্টরের পদ গ্রহণ করিলেন।

জঙ্গ বাহাদুরের শাসনের একাদশ বৎসরে (১৯১৪ সংবৎ) ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্য, বিখ্যাত, ভীষণ সিপাহীবিদ্রোহে আমূলতঃ কম্পিত হইয়া উঠিল। হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের মধ্যে প্রায় সকলেরই মনে ন্যূনাধিক আশার সঞ্চার হইল। ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের মধ্যে, নেপালকে প্রভাবশালী জানিয়া, এক এক করিয়া প্রায় সকল রাজাই উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, জঙ্গ বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন। কেহ তাঁহাকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ জন্য অনুরোধ ও উত্তেজন করিলেন, কেহ তাঁহার মতামত প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দূরদর্শী সুচতুর জঙ্গ সহসা কাহাকেও কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ইংরাজেরাও সন্ধি ও মিত্রতাসূত্রে জঙ্গের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপে উভয় পক্ষ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া, জঙ্গ বিশেষ বিবেচনার পর ইংরাজদিগের চরম বিজয় দর্শন করিয়া,

তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। উভয় পক্ষে সন্ধি হইল যে জয় লাভ হইলে, ইংরাজ গঙ্গার উত্তরতীর হইতে নেপালের সমসীমক সমস্ত ভূভাগ নেপালকে অর্পণ করিবেন।

এইরূপে সন্ধি-বন্ধন হইলে পর, জঙ্গ বাহাদুর, উক্ত বৎসরের বৈশাখ মাসে জেনরেল বদরিনরসিংহ ও কর্ণেল পহলমান্ সিংহ বসানতকে ১৬০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংরাজের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। পরে অগ্রহায়ণ মাসে ৬০০০ সেনা লইয়া স্বয়ং লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ ও পূর্ব্বোক্ত নেপালী সৈন্য লক্ষ্ণৌ অবরোধ করিয়া কালক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু জঙ্গ উপস্থিত হইয়া, সেই ক্ষণেই আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন এবং স্বয়ং অগ্রণী হইয়া অদ্ভুত সাহসসহকারে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর অবিলম্বেই শত্রুদিগকে পরাজয় ও লক্ষ্ণৌ আত্মসাৎ করিলেন। আক্রমণে কর্ণেল মদনমানসিংহ ও বিস্তর গোরখা সৈন্য নিহত হইল।

বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে জঙ্গ গবর্ণর জেনরেলের নিকট প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সন্ধিতে যে পুরস্কার স্থিরীকৃত হইয়াছিল বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং গবর্ণর জেনরেল অগত্যা তাঁহাদিগের পত্র দেখাইয়া, জঙ্গকে জানাইলেন যে তাঁহাদের অনভিমতে তিনি পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। তবে নেপালের দক্ষিণ পশ্চিম সীমা হইতে ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ ও ৭ ক্রোশ বিস্তৃত ভূভাগ নেপালকে অর্পণ করিতে পারেন। জঙ্গ বিস্মৃত ও ক্রুদ্ধ

হইলেন; কিন্তু দেখিলেন হয় প্রস্তাবিত ভূভাগ গ্রহণ, না হয় যুদ্ধ ঘোষণা ভিন্ন, অন্যতর পক্ষ নাই। প্রবল ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াও ধ্বংসের কারণ হইবে বুঝিয়া অগত্যা গবর্ণরজেনরেলেরই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। নবলব্ধ প্রদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া জঙ্গ তথায় বাঁকী নামক এক কাছারী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে ইংরাজেরা জঙ্গকে জি, সি, এস, আই, উপাধি প্রদান করেন। সামান্য জঙ্গ, এক্ষণে "স্বস্তি শ্রীমদতি প্রচণ্ডভুজদণ্ডেত্যাদি মহারাজ সার জঙ্গ বাহাদুর রাণাজি, জি, সি, বি, এণ্ড জি, সি, এস, আই, থেং, লিং, পিম্, কো, কাং ওয়াঙ, সিয়াঙ, প্রাইম মিনিষ্টার এণ্ড কমাণ্ডার ইন্ চিফ্" নাম ধারণ করিলেন।

এইরূপে দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়া জঙ্গ মনোমত বিবিধ ভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শাসনের ত্রিংশ ও বয়ঃক্রমের ষষ্টি বর্ষ উপস্থিত হইল। ১৯৩৩ সংবতে মৃগয়াসক্ত জঙ্গ, মৃগয়ার্থ রাজ্যের দক্ষিণ কাননে পাথরঘাটা নামক স্থানে গমন করিলেন। হঠাৎ ফাল্গুনী শুক্লা দ্বাদশী দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইল।

নেপালাধিপতি, বিবিধ-সুখ-ভোগ-সম্ভুক্ত, মহা সমৃদ্ধ জঙ্গ এইরূপে আত্মীয়বর্গের অগোচরে গহনকাননমধ্যে সহসা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নেপালে তিন জন প্রধান পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম রাজা পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল উপার্জ্জন করেন; দ্বিতীয় প্রাইম মিনিষ্টার ভীমসিং থাপা নেপালরাজ্য গঠন, এবং উহাকে

অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়া যান; তৃতীয় জঙ্গবাহাদুর ঐ সুসজ্জিত সুগঠিত রাজ্যের সুখভোগ করেন। ইতিহাস দৃষ্টে ইহা সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়।

জঙ্গ বাহাদুর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, উদ্‌যোগী, ক্ষিপ্রকারী, উপস্থিতমতি, সাহসিক, ও উচ্চাভিলাষী বীর পুরুষ ছিলেন। দয়াদাক্ষিণ্য এবং তিতিক্ষাদি সদ্‌গুণেও তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত ছিল। তিনি আত্মীয় বন্ধুবর্গের পরিপোষক এবং আশ্রিতজনের প্রতিপালক ছিলেন। সুনাম তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। এই সুনাম-প্রিয়তা-নিবন্ধন তিনি বিদেশীয় অভ্যাগত ও বণিকজনের বিশেষ সমাদর ও সহায়তা এবং স্বজাতীয়দিগের প্রতি যথেষ্ট স্নেহভাব প্রদর্শন করিতেন। তিনি মিষ্টভাষী বিনীত ও বিলক্ষণ সদালাপী ছিলেন। মৃগয়া ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। মৃগয়ামোদ জন্য কাটমুণ্ডের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে নাগার্জ্জুন নামক কাননের ১৮ক্রোশ,প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া,তন্মধ্যে বৎসরের অধিক ভাগ মৃগয়া করিতেন। বিবিধ মৃগব্যপশু তন্মধ্যে রক্ষিত হইত। আমাদিগের মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুবরাজ এলবার্ট নিমন্ত্রিত হইয়া জঙ্গবাহাদুরের মৃগয়া নৈপুণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

রাজ্যসম্বন্ধে জঙ্গবাহাদুর অধিক কিছুই করেন নাই। তবে গোরখা ভাষায় আইন অনুবাদ ও প্রচলন করিয়া বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছে।

রাজ্যেশ্বর জঙ্গবাহাদুর কানন মধ্যে সহসা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, এ সংবাদ তাঁহার ভ্রাতা ধীরসমসের সিং ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হইল না। ধীরসিং ভ্রাতার মৃত্যুবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলেন না। ত্রৈলোক্য বিক্রমকে কহিলেন, মহারাজ, প্রাইম মিনিষ্টার আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনি কাল বিলম্ব না করিয়া পাথর-ঘাটায় গমন করুন; তদনুসারে কুমার ত্রৈলোক্য বিক্রম পাথরঘাটে যাত্রা করিলেন।

এদিকে ধীর, ভ্রাতা রণদীপকে প্রাইমমিনিষ্টারি এবং জগৎসমসেরজঙ্গকে কমাণ্ডারি পদে স্থাপন করিয়া, রাজ্যের সমস্ত আধিপত্য নিজের হস্তগত করিয়া লইলেন। ত্রৈলোক্য বিক্রম পাথরঘাটা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, কাণ্ডদর্শনে চমৎকৃত, মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু সহসা ক্রোধ-প্রকাশে কোন ফল দর্শিবে না বিবেচনা করিয়া, ধীরের প্রাণ বিনাশার্থ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হোমনাথ উপাধ্যায় নামক একজন সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ত্রৈলোক্যবিক্রমের প্রিয় বয়স্য ও পারিষদ ছিলেন। হোম নাথের জননী ত্রৈলোক্যবিক্রমকে স্তন্যপান করাইয়াছিলেন। সুতরাং হোমনাথ ও ত্রৈলোক্যবিক্রমে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ ছিল। ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রণয়ী এবং অনুরক্তও ছিলেন। ত্রৈলোক্যবিক্রমকে বিষণ্ণ দর্শন করিয়া, হোমনাথ কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, কুমার তাঁহার নিকট সমুদায় ব্যক্ত করিলেন এবং কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে

তদ্বিষয়ে তাঁহার পরামর্শও জিজ্ঞাসা করিলেন। হোমনাথ কহিলেন কার্য্য অতীব সুকর। জঙ্গবাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কমাণ্ডার ইন্ চিফ্ জগৎজঙ্গের সাহায্যে অভীষ্ট কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইবে। কিন্তু জগৎজঙ্গের সহিত পরিচয় না থাকায় ত্রৈলোক্যবিক্রম তাদৃশ সাহসী হইলেন না। হোমনাথ পরিচয়ের ভার লইয়া উভয়কে মিলাইয়া দিলেন। পরামর্শ সমস্ত স্থির হইল, কিন্তু জগৎজঙ্গ কালাশৌচের মধ্যে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন না; অশৌচান্তে কার্য্যসাধন করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ইতিমধ্যে একাদশ মাস পরে সহসা একদিনের পীড়ায় ত্রৈলোক্যবিক্রমের মৃত্যু হইল। সকলে বিষপ্রয়োগের সন্দেহ করিল, কিন্তু কোন প্রমাণ হইল না। ত্রৈলোক্যের মৃত্যুতে ষড়যন্ত্র নষ্ট হইল। জগৎজঙ্গ মন হইতে দুরভিসন্ধি দূর করিলেন। ধীরের জীবন নিশঙ্ক হইল। তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া আধিপত্য করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্যের মৃত্যুর ৪ মাস পরে ধীর স্বয়ং কমাণ্ডারি গ্রহণ করিলেন। ৪ বৎসর পরে রাজা সুরেন্দ্রবিক্রমের মৃত্যু হইল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে বৃদ্ধ বন্দী রাজা রাজেন্দ্রবিক্রম স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রের পরলোক হইলে পর, ধীর ত্রৈলোক্যবিক্রমের পুত্র পঞ্চমবর্ষীয় কুমার পৃথ্বীবীর বিক্রমসাহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইহার অনতি পরেই ধীর বিবিধ অত্যাচার ও অন্যায় কার্য্য দ্বারা সকলেরই বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রাণ বিনাশার্থ পুনর্ব্বার এক অতি প্রবল ষড়যন্ত্র নির্ণীত হইল। মাৎবরসিংহের

পুত্র কর্ণেল শ্রীবিক্রমসিং থাপা, কর্ণেল অমর বিক্রম সিং থাপা, কর্ণেল ধীরমন সিং বসানথ প্রভৃতি রাজ্যের ৫২ জন যুবক ওমরা ধীরের প্রাণবিনাশার্থ শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ১২৮৯ সালে মাঘী সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস, দিন স্থির হইল। ঐ দিবস ঐ ৫২ জন স্ব স্ব অধীনস্থ সেনা লইয়া একত্রে আক্রমণ করিবেন স্থির রহিল। কার্য্য-সাধনের বিলক্ষণ অবসরও উপস্থিত হইল। রণদীপ মৃগয়ার্থ তরায়ে গমন করিলেন। জগৎজঙ্গও শ্রীক্ষেত্র দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুই দোষে সমুদায় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। প্রথম দোষ কাল বিলম্ব। যেমন প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, অমনি প্রবৃত্ত হইলে কার্য্য অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া যাইত। বিশেষ কাল বিলম্বে, ষড়যন্ত্র কোন না কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় দোষ, বিশ্বাসঘাতকতা। ৫২ জনের মধ্যে গগণ সিংহের পৌত্র জেনঃ উত্তরধ্বজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, গোপনে ধীরকে সমুদায় বৃত্তান্ত গোচর করাইল। গগণ সিংহের বংশ,থাপা বংশের চির-শত্রু,তখন উত্তরধ্বজকে ষড়যন্ত্র মধ্যে গ্রহণ করা শ্রীবীক্রমের কর্ত্তব্য হয় নাই।

যাহাই হউক, ষড়যন্ত্র কর্ণ গোচর হইবামাত্র ধীর ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বোম-বাহাদুরের পুত্র জেনঃ বোমবিক্রমের সহিত প্রতিবিধানের পরামর্শ করিলেন। বোমবিক্রম স্বীকার করিলেন, তিনি ৫২জনকেই বন্দী করিয়া দিবেন। স্বীকার করিয়াই উদ্যোগী বোম ঐ দিন নিশীথ সময়ে এককালে ৫২জনের বাটী অবরোধ করিয়া সুষুপ্ত অবস্থায় ৫২জনকে বন্দী করিলেন।

এইরূপে ৫২জন বন্দী হইলে পর বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে পূর্ব্বোক্ত হোমনাথ সুবা, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা টঙ্কনাথ সুবা, দুইজনে চর বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। ক্রমে বন্দীদিগের পীড়ন আরম্ভ হইল। বন্দীদিগের মধ্যে

মেজর সংগ্রামশূর, ধীরসিংকে কহিলেন, ইতি পূর্ব্বেও আপনাকে মারিবারজন্য আর এক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। কুমার ত্রৈলোক্যবিক্রম,জগৎজঙ্গ, বোমবিক্রম ও কুমার নরেন্দ্রবিক্রম ঐ ষড়যন্ত্রের নায়কছিলেন। কর্ণেল অমৃতসিংহ এই বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত আছেন।

রহস্য প্রকাশ হইবামাত্র বোমবিক্রম বন্দী হইলেন। বোম নিজ দোষেই বন্দী হইলেন বলিতে হইবে। কারণ তিনি যখন পূর্ব্ব ষড়যন্ত্রে লিপ্তছিলেন, তখন উপস্থিত ষড়যন্ত্রে ধীরের সহায়তা করা বোমের বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য হয় নাই। বিশেষ তিনি জানিতেন যে উপস্থিত ৫২জন ষড়যন্ত্রীর মধ্যে অমৃতসিংহ ঐ বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন।

যাহাই হউক বোমবিক্রম বন্দী হইলে পর,অমৃতসিংহের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। অমৃতসিংহ পূর্ব্ব ষড়যন্ত্রের সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিলেন। পরে কহিলেন,জগৎ-জঙ্গের সহিত ত্রৈলোক্য-বিক্রমের পরিচয় ছিল না। হোম-নাথ উপাধ্যায় সুবা উহাদিগকে ঐ সূত্রে পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য হোমনাথ বন্দী হইয়া তাঁহার ভ্রাতা ও আর ১০জন ব্রাহ্মণের সহিত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কারণ নেপালে ব্রাহ্মণ অবধ্য।

বন্দী ৫২জনেরমধ্যে শ্রীবিক্রম প্রভৃতি ৩৬জনেরশিরশ্ছেদন করা হইল। এবং বোমবিক্রম ও নরেন্দ্রবিক্রম ইংরাজ হস্তে ন্যস্ত হইলেন। জগৎজঙ্গ এই সময় জগন্নাথ দর্শন করিয়া স্বদেশ যাইতেছিলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল মিত্রতানুরোধে সিমলা হইতে তারযোগে নিশেধ করাতে তিনি নিবৃত্ত হইলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি নেপালরাজ্য ঐরূপ সুশৃঙ্খলাবস্থায় চলিয়া আসিতেছে।

সম্পূর্ণ।